একাত্তরের গণহত্যা

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ | বশীর আল্‌হেলাল

চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬
তৃতীয় মুদ্রণ
নভেম্বর ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০০৯
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

একাত্তরের গণহত্যা
হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট
অনুবাদ : বশীর আল্‌হেলাল

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪
dibyaprakashbooks@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস
বাঁধন কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
গোপাল সাহা লেন, ঢাকা।

অনলাইনে বই পেতে
www.rokomari.com/dibyaprakash
01519521971
www.porua.com.bd/dibyaprakash

মূল্য : ১২৫ টাকা। US $ 4

ISBN 984 483 074 5

সূচি

বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা

বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজিত পূর্ব কমাণ্ড ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের মতে) বিজয়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌথ কম্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হাজার মাইল দূরে (পশ্চিম) পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ইতিহাসের এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল, আজকের দিনে আমরা তা মোটামুটি জানি। বলা যায় (পশ্চিম) পাকিস্তানের জনসাধারণের বুকে এ ঘটনা শেল হেনেছিল। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহ্য়া খান পদত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিরূপে পিপ্‌ল্‌স্‌ পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। আজ পাকিস্তানে এ ঘটনাকে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানের বিপর্যয়, পূর্ব পাকিস্তানের ট্রাজেডি, আরো বলা হয় ঢাকার পতন। দুঃখে অপমানে জর্জরিত (পশ্চিম) পাকিস্তানের জনসাধারণ জানতে চান, পূর্বপাকিস্তানে কী হয়েছিল, কেন হয়েছিল? বিশেষ করে চিরশত্রু ভারতীয় বাহিনীর কাছে পরাজয় ও অস্ত্রসমর্পণ, ভারতের সহায়তায় নবরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়, পূর্ব ফ্রন্টে ভারতীয় বাহিনীর কাছে প্রায় ৯০ হাজার পাকিস্তানি সেনার বন্দীত্ববরণ, এসব তাঁদের অপমানের জ্বালা ও বিক্ষোভকে আরো প্রচণ্ড করেছিল। তদন্তের দাবিও এমন প্রচণ্ড হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। না হলে ভুট্টো এসব জিনিস চাপা রাখতে চেয়েছিলেন। কেন চেয়েছিলেন আমরা তা জানি। এখানে জানা দরকার এ বিপর্যয়ে (পশ্চিম) পাকিস্তানের মানুষ এতখানি হতচকিত কেন হয়েছিলেন? পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সে নয় মাস যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছিলেন জনসাধারণ যাতে সত্য জানতে না পারে। তথ্য- ও প্রচার-মধ্যমগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। বিদেশি সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছিল। বিবিসি ইত্যাদি বিদেশি মাধ্যমগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল পক্ষপাতমূলক ও পাকিস্তানের বিপক্ষে শত্রুতামূলক আচরণ তারা অবলম্বন করেছে। এ-রকম পরিস্থিতিতে সব সময় প্রস্তুত থাকে যে অন্ধ জাতি-অভিমান, এবং তার সঙ্গে যদি থাকে অতিরিক্ত ধর্মীয় ভাবাবেগগুলি, তা জনসাধারণকে কীরকম বোকা বানিয়ে রাখতে পারে তাও আমরা জানি। বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন সচেতন বিবেকবান মানুষও যে পশ্চিম পাকিস্তানে একেবারে ছিলেন না তা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির বিরুদ্ধে কোন্ অন্যায় ও তাঁদের উপর কী অসম্ভব নির্যাতন হয়েছে, স্বৈরাচারের দমন উৎপীড়ন, নাগরিক ও মানবীয় অধিকারের সীমাহীন লঙ্ঘন হয়েছে সে-ব্যাপারে কলম একেবারে বন্ধ না রাখতে গিয়ে সরকারি

নিষেধ লঙ্ঘন করে প. পাকিস্তানে কেউ কেউ জেল র্যন্ত খেটেছেন। এ-রকম অবস্থায় শেষ পর্যন্ত যা হয়, (প.) পাকিস্তানের হতাশ ও পরাজিত দিশাহারা মানুষ যে বুলি ধরেছিল তা হচ্ছে 'বাঙ্গালি মুসলমান গদ্দার নিক্‌লে!'—বাঙালি মুসলমান দেখা গেল বিশ্বাসঘাতক!

জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, বলা যায়, তাঁদের ঠাণ্ডা ও শান্ত করতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ১৯৭১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মিস্টার জাস্টিস হামুদুর রহমানের অধিনায়কতায় এ কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনের অন্য দুই সদস্য পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের জজ্ জাস্টিস এস্. আনওয়ারুল হক এবং সিন্ধু ও বালুচিস্তান হাই কোর্টের চিফ জাস্টিস জাস্টিস তুফায়িল আলি আবদুর রহমান। অবসরপ্রাপ্ত লে. জে. আলতাফ কাদির ও পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার এম. এ. লতিফ কমিশনের, যথাক্রমে, সামরিক উপদেষ্টা ও সেক্রেটারি। তদন্তের বিষয়: কোন্ পরিস্থিতিতে ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের কম্যাণ্ডার আত্মসমর্পণ করেন, এবং তাঁর কম্যাণ্ডের অধীন পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেন, এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত বরাবর ও জম্মু ও কাশ্মির স্টেটের যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া হয়।

এ কমিশন হামুদুর রহমান কমিশন নামে পরিচিত হয়। কমিশন ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে গোপনীয়ভাবে কার্যক্রম শুরু ক'রে ২১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পরীক্ষা ও রেকর্ড করেন। ১২ই জুলাই ১৯৭২ প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে রিপোর্ট দেন (ইংরেজিতে)। কমিশন এ রিপোর্টকে সাময়িক, 'টেনটেটিভ' বলেন। কারণ ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের কম্যাণ্ডার ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ অফিসাররা তখনো ভারতে যুদ্ধবন্দীরূপে অবস্থান করছিলেন। পূর্বপাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য ও বক্তব্য পরীক্ষা ও রেকর্ড করা গেলে তবে রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব ছিল। ভারত থেকে যুদ্ধবন্দীরা ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে ফিরে এলে মে মাসে অ্যাবোটাবাদে কমিশন আবার কার্যক্রম শুরু ক'রে সম্পূরক রিপোর্ট প্রদান করেন। এবার ৭২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ ও পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে :

(ক) লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি, পূর্ব কম্যাণ্ডের কম্যাণ্ডার;

(খ) পূর্বপাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন এমন সকল মেজর-জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার;

(গ) রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ, পাকিস্তান নেভির ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং;

(ঘ) এয়ার কমোডর ইনাম, সর্বজ্যেষ্ঠ এয়ারফোর্স অফিসার;

(ঙ) মেজর-জেনারেল রহিম খান; তাঁর অনুরোধে পুনঃপরীক্ষিত;

(চ) চিফ সেক্রেটারি, পুলিশের ইন্সপেকটর-জেনারেল, দুই বিভাগীয় কমিশনার-সহ কিছু অসামরিক অফিসার।

মূল রিপোর্টের উপর এ সম্পূরক রিপোর্টের গুরুত্ব কী সে-সম্পর্কে এবং এতে কমিশন মূল ও সম্পূরক সম্পর্কে যে-সব ব্যাখ্যা ও মন্তব্য করেছেন তার কিছু কিছু পরে বলছি।

পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এখানে জানানো দরকার যে, হামুদুর রহমান কমিশন ছাড়া পাকিস্তান সরকার 'আফতাব কমিশন' নামে আরো একটি তদন্ত কমিশন জ্যেষ্ঠ সামরিক অফিসারদের নিয়ে গঠন করেছিলেন যার কথা এ বইয়ে পাওয়া যাবে। এটা খুব সম্ভব হা. র. কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার গঠন করেন, যার তারিখ আমি জানতে পারি নি।

কমিশন সম্পূরক রিপোর্টে জানিয়েছেন, সম্পূরক তদন্তের ফলে তাঁদের মূল রিপোর্টের সিদ্ধান্ত, বক্তব্য, ইত্যাদির বিশেষ পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হয় নি।

কিন্তু হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যে কথা দিয়েছিলেন তিনি তা রাখলেন না। পূর্বপাকিস্তানে কী হয়েছিল কেন হয়েছিল দেশবাসীকে জানাবেন বলেছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁর পর প্রত্যেক গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক সামরিক সরকারের প্রধান এবং ভুট্টোকে ফাঁসিতে যিনি ঝুলিয়েছিলেন সেই জেনারেল জিয়াউল হক থেকে ভুট্টো-কন্যা বে-নজির ভুট্টো, নওয়াজ শরিফ, জেনারেল পারভেজ মোশররফ সবাই এমন ভাব দেখিয়েছিলেন যে, ওই রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে পড়লে পাকিস্তানের যেটুকু আছে কোনো আর এক বিপর্যয়ে যেন তা লোপ পেয়ে যাবে। এ বিষয়ে অনেক পর্যালোচনা হয়েছে পাঠক জানেন। কাহিনী হিসাবে পাকিস্তান-বিচ্ছিন্ন স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে আজ আর তার কী মূল্য? ভুট্টো নাকি বলেছিলেন ওই রিপোর্টের কপিগুলি সব পুড়িয়ে ফেলা দরকার, যদিও বিচারপতি হামুদুর রহমান সম্পর্কে অভিযোগ ছিল রিপোর্টে তিনি পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন ভুট্টোরই অনুকূলে এমনকি ভুট্টোর কাছ থেকে পাওয়া তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদানে। রিপোর্টে পূর্বপাকিস্তানের বিপর্যয়ের জন্যে ভুট্টোর রাজনৈতিক ভূমিকাকে উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর সামরিক ভূমিকাকে বড় করে দেখানো হয়েছে, বিচারপতি হামুদুর রহমানের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে অভিযোগ। কিন্তু ধরুন মিডিয়ার বা ইতিহাসের বিশ্লেষকরূপে আমরা এখানে যেটা দেখি, হামুদুর রহমান কমিশনের তদন্তের সরকার-নির্ধারিত বিচার্য বিষয় ছিল, আমরা আগে দেখেছি, সংক্ষেপে, সেনাবাহিনীর ভূমিকা পরীক্ষা করে দেখা, কেন কী অবস্থায় তাঁদের ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো। ভুট্টো ইচ্ছা করে কমিশনের এ সীমিত বিচার্য নির্ধারণ করেছিলেন এ সত্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, জেনারেল নিয়াজীর কম্যাণ্ডের অধীন পূর্ব কম্যাণ্ড পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিপূর্ণ সামরিক অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল এবং তার যে প্রধান কারণ সামরিক বাহিনীরূপে তার প্রায় যাবতীয় নৈতিক অধঃপতন এবং নীতিভ্রষ্ট স্বৈরাচারী উদ্দেশ্যকে নিয়ে লড়াই চালানো, কমিশনের রিপোর্টে নির্ধারিত বিচার্য অনুযায়ী কেবল তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের বিপর্যয়ে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক ব্যর্থতা দায়ী কি না, কতখানি দায়ী তদন্তকালে এর পরীক্ষা ও বিবেচনা হয়েছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যতদূর জানা যায়, হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে এ কাজটিও প্রসঙ্গত হলেও হয়েছে। ১৯৪৭-পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসের বাঙালির যাবতীয় বঞ্চনার কথা এতকাল পরে মনে হয় এই প্রথম এ কমিশনের রিপোর্টে একটি সরকারি দলিলে স্থান পেয়েছে। জেনারেল আইয়ুব খান, জেনারেল ইয়াহ্য়া খানদের সামরিক-রাজনৈতিক যথেচ্ছাচারের

তালগোলের কিছু-কিছু উল্লেখও এতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ভুট্টো সাহেবের কথা বলছিলাম। ভুট্টোর রাজনৈতিক ভূমিকাই যে পাকিস্তানের ললাটে সে ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির ভাগ্যলিপি লিখে দিয়েছিল এ প্রশ্ন কমিশনের রিপোর্টে অনুচ্চারিত থাকে নি। পরে পাকিস্তানের নতুন ডামাডোলের নতুন পটপরিবর্তনে হতভাগ্য ভুট্টোর ফাঁসি কার্যকর করার পর জেনারেল জিয়াউল হক নাকি ওই রিপোর্টের কপি হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন, যাতে ওতে তিনি ভুট্টোর চরিত্রনাশের কিছু উপাদান পান। সিন্ধুর লারকানায় মরহুম ভুট্টোর বাড়িতে অকস্মাৎ অনধিকার ঢুকে পড়ে তাঁর পড়ার ঘরের টেবিলেই জেনারেল জিয়াউল হক রিপোর্টের একখানা কপি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও রিপোর্ট হাতে পেয়ে যে তা প্রকাশ করতে পারেন নি তার সহজ কারণ পাকিস্তানি মিলিটারির সে সাংঘাতিক খ্যাতি জগৎবাসীর সামনে বরবাদ হতে তিনি কেমন করে দেন?

যাই হোক, পরের কথা আগে বলা হয়ে গেল। হামুদুর রহমান কমিশনের মূল, তারপর সম্পূরক রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করা হলো কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। অস্থির পাকিস্তানিরা জানতে পারল না ওতে কী আছে। যা হয়, ওতে কী আছে তার কানাঘুষা চলল। সে কানাঘুষা তারপর কলমে কলমে ছড়াতে লাগল। প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানে ঢাকার পতন দিবস পালিত হয়। ওই দিন বিশেষ করে ১৯৭১-এর ঘটনাকে নিয়ে সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যাগুলোতে নানা লেখালেখি হয়। তর্কাতর্কি অভিযোগ পালটা-অভিযোগে পরাজিত সেনাবাহিনীর অফিসাররাও কেউ কেউ নেমে পড়েন। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টেও কী আছে কী নেই এই নিয়ে অনুমান ও অনুসন্ধান-ভিত্তিক লেখালেখি হতে হতে তার সত্য আধা-সত্য নানা কিছুও বেরিয়ে পড়তে থাকে। খবরের কাগজের এমন খোরাক সাংবাদিককুলের প্রতিযোগিতাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে আমরা জানি। কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন উদ্ধৃতি, কমিশনেকে দেয়া বিশেষ করে জেনারেলদের নানা বক্তব্য জবানবন্দি ও অন্যান্য দলিলের একটি সঙ্কলন উর্দুতে লাহোর থেকে ১৯৯৩ সালে, পরে দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। পাঞ্জাবের আহমদ সলিম এটি সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেন। সঙ্কলনের নাম 'হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট: জার্নাইল আউর সিয়াসতদান' (হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট: জেনারেল ও রাজনীতিবিদ্‌গণ)। আহমদ সলিম ঢাকায়ও এসেছেন কয়েকবার। তিনি কবি। বাংলাদেশের যন্ত্রনাদগ্ধ সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কবিতা লিখে তিনি পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন এমনকি কারাবাস ভোগ করেছেন। এখানে বলা দরকার: পূর্বপাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ চলা-কালে পাকিস্তানের আরো যে অল্প ক'জন এখানকার ঘটনা সম্পর্কে সত্য কথা বলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, জেলে গিয়েছিলেন, এমনকি অন্ধ দেশবাসীর তিরস্কার লাভ করেছিলেন তাঁদের আরো কয়েকজন মাজহার আলী খান, আই. এ. রহমান (সাংবাদিক), নকীব হোসেন, এ-ছাড়া মানবাধিকার আন্দোলনের নেত্রী আসমা জাহাঙ্গীরের পিতা, পরে প্রয়াত।

আহমদ সালিমের ওই সঙ্কলনের 'রিপোর্ট' খণ্ড থেকে তার প্রধান অংশগুলি আমি অনুবাদ করি ঢাকার 'দৈনিক ভোরের কাগজে'র অনুরোধে। ওই কাগজের ৯ মার্চ থেকে

২৪ মার্চ ১৯৯৫-এর সংখ্যাগুলিতে ওগুলি প্রকাশিত হয়। উর্দু থেকে করা সে অনুবাদগুলি বর্তমান সঙ্কলনে প্রকাশ করা হলো।

পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় হামুদুর রহমান কমিশনের গোপন রিপোর্টের নানা অংশের প্রকাশ ও সেগুলিকে নিয়ে লেখালেখি ১৯৯০ সালে শুরু হয়েছিল। এই সবকিছুর প্রকাশ ও উন্মোচন হয়ে যাচ্ছে দেশে-বিদেশে, তাই নিয়ে লেখালেখি, তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছে, কিন্তু পাকিস্তানের কোনো কর্তৃপক্ষই কেন হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অন্ধকার থেকে আলোয় আনার প্রয়োজন বোধ করছেন না? উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠিত বিচলিত দেশবাসী বিশ্বাস-অবিশ্বাস সংশয় বিভ্রান্তির মধ্যেই থাকুক এই চেয়েছেন তাঁরা। ওদিকে তাঁরা উদ্‌যাপন করেন ঢাকা পতন দিবস, সেদিন এদিকে বাংলাদেশে আমরা পালন করি বিজয় দিবস। বাংলাদেশের মানুষ ইতিমধ্যে দাবি করতে শুরু করেছেনঃ (ক) তাঁদের সে বর্বর ও ভয়ানক গণহত্যা, দমন জুলুম ও স্বৈরাচারী অনধিকারচর্চার জন্য পাকিস্তানকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, (খ) ক্ষতিপূরণ করতে হবে, (গ) বিচ্ছিন্নতা-পূর্ব পরিসম্পদের প্রাপ্য ভাগ দিতে হবে। পাকিস্তানের ভেতর থেকেই বেসরকারিভাবে, ব্যাপক না হলেও, এর সমর্থন উঠতে শুরু করে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে যা ঘটে, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও গণতন্ত্র, তার বৈদেশিক সম্পর্কগুলি আবার মার খায়। সর্বশেষ মুসলিম লীগের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয় সামরিকতন্ত্র, যদিও এ-দফা সরকারিভাবে একে মার্শাল ল প্রশাসন বলা হয় না।

তখন মহা চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিল্লি থেকে প্রকাশিত ভারতের পাক্ষিক 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় হামুদুর রহমান কমিশনের মূল নয়, সম্পূরক রিপোর্ট বেরিয়ে গেল। বাংলাদেশের কাগজগুলোতেও তা বের হলো।

হামুদুর রহমান কমিশনের সম্পূরক রিপোর্ট সম্পর্কে আগে বলেছি। এ রিপোর্টের ও এ রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে পড়ার গুরুত্ব এই যে, এর ফলে কমিশনের মূল রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবি পাকিস্তানের ভিতরে ও বাইরে আরো জোরদার হয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমানের সমরতান্ত্রিক সরকারের প্রধান নির্বাহী যাঁকে বলা হচ্ছে সেই জেনারেল পারভেজ মোশাররফ প্রথমে বলেছিলেন, না, ও প্রকাশ করা হবে না, কারণ পাকিস্তানের মিলিটারির ক্ষতি হবে। কিন্তু চাপে পড়ে এখন তাঁকে রাজি হতে হয়েছে। তিনি কমিটি গঠন করে নাকি মূল রিপোর্ট পরীক্ষা করাচ্ছেন। জানিয়েছেন, করা যায় বলে যদি মনে হয়, মূল রিপোর্টের সব নয়, আংশিক প্রকাশ করা হবে। মনে হয়, এ সবই ধানাই-পানাই ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক, আমি যতদূর বুঝি, মূল রিপোর্ট সমগ্রত বা অংশত প্রকাশ হওয়া না-হওয়া এখন আর আগের মতো গুরুত্ব বহন করে না। সম্পূরক রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে পড়া তার একটা কারণ। সম্পূরক রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে পড়ায় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা হয়েছে, ১৯৯০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানে বা অন্যত্র প্রকাশ হতে থাকা কমিশনের দলিলপত্রগুলি যে মাত্র আনুমানিক বা অনির্ভরযোগ্য নয়, এগুলি সাধারণভাবে সত্য ও বাস্তব, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সেইসব অনেকগুলি দলিলেরই বাংলা অনুবাদ আমরা এ বইয়ে প্রকাশ করলাম।

এ দলিরগুলি সম্পর্কে আর একটা গুরুত্বপূর্ন কথা এই যে, মূল রিপোর্ট যখন বা যদি পূর্ণত বা অংশত প্রকাশিত হয়, তার থেকে আরো কী আমরা পাব জানি না, হয়তো ধরুন মুক্তিযুদ্ধ কালে বা তার আগে থেকে বড় বিশ্বশক্তিগুলোর সঙ্গে পাকিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্কগুলির নতুন উত্থানপতনের কী প্রক্রিয়া চলছিল বা শুরু হয়েছিল তার ইঙ্গিতগুলি তার থেকে পাওয়া যেতে পারে, না হলে এ বইয়ে সঙ্কলিত দলিলগুলি থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বা পাকিস্তানের ভেঙে যাওয়ার, সকল তথ্য যদি নাও বলতে পারি, তার পূর্বাপর প্রায় সকল ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কমিশনের সুপারিশগুলিও এ বইয়ে আছে। সম্পূরক রিপোর্টকে আমরা মূল রিপোর্টের, যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি, তার টীকা-ভাষ্যও বলতে পারি। সে সম্পূরক রিপোর্ট এখন আমাদের হাতে। তার ভিত্তিতে কতকগুলি কথা আমরা এ ভূমিকাতে ইতিমধ্যে বলেছি। আরো দু-একটি কথা বলি।

যে-কথা আগে বলেছি, হামুদুর রহমান কমিশনকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাতে পূর্বপাকিস্তানের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় তদন্তের পূর্ণ বিচার্য দেয়া হয় নি। কেবল পাকিস্তান বাহিনীর পূর্ব কম্যাণ্ডের, তাঁদের ভাষায়, ভারতীয় বাহিনীর কাছে পরাজয়ের কার্যকারণ সংক্রান্ত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। অর্থাৎ কেবল সামরিক কার্যকারণ সম্পর্কে বলতে বলা হয়েছিল। তৎকালীন সদ্য-প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো সচেতনভাবে এই গণ্ডির মধ্যে তদন্তকে রাখতে চেয়েছেন। কমিশন যে-সব জেনারেলকে সাক্ষ্য, জবানবন্দি বা বক্তব্য দিতে তলব করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এ-বিষয়ে কম, কেউ কেউ প্রবল আপত্তি করেছেন। যেমন মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. রহিম খান হামুদুর রহমান কমিশনকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করে এর রিপোর্টের সত্যতা ও সততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, ১৯৭১ সালের পূর্বপাকিস্তান ট্রাজেডিতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কী তার তদন্ত হওয়া দরকার। তা করা হলে তবে তদন্ত পূর্ণ হবে। না হলে নয়। এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রের ভূমিকা যথার্থ ছিল না তিনি এ কথাও বলেছেন। পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধানের যে প্রশ্নটি অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সে প্রক্রিয়াটিকে বরবাদ করে দেয়ার জন্য দায়ী কারা এ প্রশ্ন করা হয়েছে। রহিম খান বলেছেন অসামরিক আমলাদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছে। রহিম খান দুই প্রধান রাজনীতিবিদকে অন্যায়ভাবে রেহাই দেয়ার কথা যখন বলেছেন, বলা বাহুল্য, পিপল্‌স পার্টির প্রধান ভুট্টো এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলা হয়েছে। এমনকি বিচারপতি হামুদুর রহমান যে বাঙালি এ কথাও কেউ কেউ বলতে ছাড়েন নি। এখানে উল্লেখ্য, তিনি এখন বেঁচে নেই।

কিন্তু হামুদুর রহমান কমিশনের এ সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন বাদ দিয়ে কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে এই বলা যায়, একেবারে অপ্রশংসনীয় কাজ এ নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং, তাঁদের ভাষায়, পূর্বপাকিস্তান ট্রাজেডির রাজনৈতিক কার্যকারণ ও প্রেক্ষাপটের আলোকপাত রিপোর্টে করা হয়েছে। ভুট্টো, ইয়াহ্ইয়া খান, আইয়ুব খান এঁদের কথা কী বলব, এঁরা স্বার্থবাজ শোষক ও সাম্রাজ্যবাদীদের অলিখিত প্রতিভূ। (পশ্চিম) পাকিস্তানের বহুল মানুষের মেজাজই এমনভাবে গড়া, তাঁরাও রাজনৈতিক সমাধানের গুরুত্ব ও গণতন্ত্র বোঝেন না। পূর্বপাকিস্তান ট্রাজেডির পরে তাঁদের এখন চোখ নিশ্চয়

খুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে নিশ্চয় কখনো এ ব্যাপারে বড় ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা তথা তদন্ত হবে। আমরা এইটুকু বলতে পারি, বর্তমান বইয়ে সংকলিত জবানবন্দি বক্তব্য মন্তব্য ইত্যাদি থেকে একটা কথা পাকিস্তানের বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন যে কোনো মানুষ এখন বুঝবেন, কোন্ ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক কারণে দুই পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। দুই অংশ প্রায় কোনো দিক থেকে এক দেশ ছিল না। এবং এই মাটি ছিল এ ভূখণ্ডের মানুষের। তারা যা চায় তাই হওয়ার দরকার ছিল। সেই কবেকার কথা, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে নিয়ে জিন্নাহ্ সাহেবরা বাঙালি বা বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে কী না প্রবঞ্চনা করেন, মওলানা ভাসানী চিরকাল যার উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী ছিলেন। পাকিস্তানি জুলুমবাজরা ধর্মকেও এ ক্ষেত্রে আসলে কোনো গুরুত্ব দিয়েছিল বলে মনে হয় না, যদিও কমিশনের রিপোর্টে ধর্মের কথা শোনা যায়। প্রথমে ওরা ধরেছিল ভাষাকে। সুবিধাবাদীর মতো বাংলাকে ধরে নিয়েছিল উর্দুর চেয়ে নিম্নস্তরের ভাষা বলে। পরে, ইসলাম কখনো যা বলে না, বাঙালি মুসলমানকে তারা সম্পূর্ণ ভুল বিবেচনার থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানের চেয়ে নিম্নস্তরের মুসলমান বলে মনে করে আত্মতুষ্টি বোধ করেছিল, যার আবার উদ্দেশ্য ছিল সেই শোষণ। পূর্বপাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদেরও হত্যার যুক্তি তারা কী দাঁড় করিয়েছিল পাঠক তা দেখবেন।

নির্ধারিত বিচার্য যত সীমাবদ্ধই থাকুক না কেন, হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের এই পরিণতির রাজনৈতিক কার্যকারণ, তাৎপর্য এবং তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও তুলে ধরার প্রয়াস যে করা হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তদন্ত কালে কমিশন পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালি খান, অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাজনীতিবিদ মুফ্‌তি মাহমুদ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউনসিল)-এর সভাপতি সরদার শওকত হায়াত খান প্রমুখ রাজনীতিকদের দীর্ঘ সব বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানকে কারা ভাঙল, মিলিটারি জেনারেলরা না রাজনীতিবিদরা, এ রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলি থেকে তা পাওয়া যায়। ওই তিন নেতার বক্তব্য বা সাক্ষাৎকারগুলি অবশ্য এ সঙ্কলনে দেয়া হয় নি। এ-সব আমরা আগের থেকে জানি।

পাঠক তাঁদের নানা প্রশ্ন ও কৌতূহলের উত্তর এ সঙ্কলনের দলিলগুলো থেকে পাবেন, হয়তো পাবেন না। কোনো কোনো বিতর্কের সুরাহা পাবেন কিংবা পাবেন না। একটার কথা বলি। জেনারেল ফরমান আলীর ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বপাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার যে সাংঘাতিক অভিযোগকে কমিশন যথাসাধ্য পরীক্ষা করে তার থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন, এটা গ্রহণযোগ্য কিনা? কমিশনের সম্পূরক রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর ঢাকার সাংবাদিকদের মধ্যে কাউকে কাউকে এ জায়গাটায় ঠোঁট বাঁকাতে দেখেছি। সব বাদ দিয়ে এটার উপর আমি গুরুত্ব দিচ্ছি এইজন্যে যে, ওই জঘন্য অমোচনীয় অপরাধের জন্যে প্রকৃত দায়ী যারা এই সিদ্ধান্ত দ্বারা তাদের আরো নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে সাহায্য হবে। পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি বুদ্ধিজীবীহত্যার কাজ একাত্তরের ২৫শে মার্চ থেকেই শুরু হয়ে তা চলেছিল, যা পাকিস্তানের সেনারাই চালিয়েছিল, কখনো রাজাকাররা করেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে ডিসেম্বর

মাসে প্রধানত ঢাকায় (ও অন্যখানে) বুদ্ধিজীবীদের যে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়েছিল এখানে তার কথা বলছি। এ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের সঙ্গে জেনারেল ফরমান আলীর সম্পর্ক ছিল না, কমিশনের এ সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা? অবশ্য কমিশন এ বিষয়ে আরো তদন্ত করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন।

আর একটা কথা। এ বইয়ে যে দলিলগুলো দেয়া হলো এগুলো পাওয়া গেছে হামুদুর রহমান কমিশনের গোপন সম্পূরক রিপোর্ট 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ার অন্তত সাত বছর আগে। এগুলির উর্দু পাঠ যে বইয়ে সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেছেন, আগে বলেছি, পাকিস্তানের পাঞ্জাবের কবি ও লেখক ও বাঙালি-দরদি আহমদ সলিম, সেটি তাঁর বৃহৎ কাজ। বাংলাদেশের মুক্তিপাগল বাঙালি, লেখক, গবেষক এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। তিনি সে সময় এ বই ছেপে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

আমি উর্দু যেটুকু জানি, এ জিনিসগুলোর বাংলায় অনুবাদের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল। তবে একটা বড় অনুবাদের অনেক সময় আদ্যোপান্ত সমান ভালো হয় না।

ایڈمرل احسن کا بیان

میں یکم ستمبر ۱۹۶۹ کو ڈپٹی چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر (نیوی) اور مالیات، منصوبہ بندی کمیشن، صنعتوں، تجارت و خوراک و زراعت کی انتظامی کونسل کے رکن کی ذمہ داریاں چھوڑ کر گورنر مشرقی پاکستان مقرر ہوا۔ اسی روز پاکستان نیوی کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے مجھے ریٹائر کر دیا گیا۔ اس عہدہ پر میں نے کچھ ہی کم تین برس تک کام کیا۔

جب انتظامی کونسل کو سول کابینہ مقرر ہونے کے نتیجہ میں توڑا جا رہا تھا تو میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے واپس نیوی میں جانے دیا جائے۔ میں نے پندرہ برس کی عمر میں نیوی کی ملازمت اختیار کی تھی۔ اگلے تینتیس برسوں کے دوران میں نے بحری جنگ اور دفاع کے سوا اور کچھ نہ سیکھا۔ نظم و ضبط کے حامل ایک فوجی افسر کے طور پر میں سیاست سے دور رہا اور صرف سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران سیاستدانوں سے ملا۔ کمانڈر انچیف بننے سے پہلے میں نیوی سے باہر سات سال تک دوسرے فرائض ادا کرتا رہا۔ چار سال میں نے بنکاک میں سیٹو کے تحت ڈپٹی اور چیف ملٹری پلاننگ آفس میں گزارے اور تقریباً تین سال ڈھاکہ میں آئی ڈبلیو ٹی اے کا چیئرمین رہا۔ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد سرکاری فرائض کی انجام دہی میں مجھے نیوی کو مضبوط اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے کام کو آگے بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ قدرتی طور پر مجھے اپنے نیوی کے اس کردار کے تمل اندوقت ختم ہو جانے پر رنج تھا جسے میں نے اتنی چاہت اور تھوڑی بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا تھا۔ صدر یحییٰ جانتے تھے کہ مجھے سیاسی عہدہ قبول کرنے میں باک ہے مگر وہ محسوس کرتے تھے کہ اس موقع پر مشرقی پاکستان کے مسائل انتہائی الجھے ہوئے تھے۔ انہیں گورنر کی حیثیت میں کوئی ایسا فرد درکار تھا جو اس حصہ کے متعلق پہلے سے تجربہ رکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا لبرل نقطۂ نظر اور بنگال کے لوگوں کے بارے میں ہمدردانہ طرزِ عمل بیش بہا سرمایہ ہے کیونکہ ان کی حکومت کی یہ پالیسی اور مقصد ہے

অ্যাডমিরাল আহসানের জবানবন্দি

আমি পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (নৌ-বাহিনী) এবং অর্থ, পরিকল্পনা কমিশন, শিল্প, বাণিজ্য, খাদ্য ও কৃষির ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যের দায়িত্বসমূহ ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হই। ওই দিনই পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফের পদ থেকে আমাকে অবসর দেওয়া হয়। ওই পদে আমি তিন বছরের কিছু কম সময় কাজ করি।

যখন ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অসামরিক মন্ত্রিপরিষদ গঠনের কারণে ভেঙে দেওয়া হচ্ছিল তখন আমি আবেদন করেছিলাম আমাকে নৌ-বাহিনীতে ফিরে যেতে দেওয়া হোক। আমি পনেরো বছর বয়সে নৌ-বাহিনীর চাকরি গ্রহণ করেছিলাম। বিগত তেত্রিশ বছর সময়ে আমি নৌ-যুদ্ধ আর প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো কিছু শিখিনি। আইন ও শৃঙ্খলার বাহক সামরিক অফিসাররূপে আমি রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছি এবং কেবল সরকারি দায়িত্বসমূহ পালন ব্যপদেশে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কমান্ডার-ইন-চিফ হওয়ার আগে আমি নৌ-বাহিনীর বাইরে সাত বছর অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছি। চার বছর আমি ব্যাংককে সিয়াটোর অধীনে ডেপুটি ও চিফ মিলিটারি প্ল্যানিং অফিসে কাটিয়েছি এবং প্রায় তিন বছর ঢাকায় আইডব্লিউটিএ-র চেয়ারম্যান ছিলাম। সামরিক আইন প্রয়োগের পর সরকারি দায়িত্বসমূহ পালন করতে গিয়ে আমার নৌ-বাহিনীকে মজবুত আধুনিক পদ্ধতিতে সুদৃঢ় রূপ দেওয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ মেলেনি। স্বাভাবিক ভাবেই আমার নৌ-বাহিনীর এই কর্মজীবন শেষ হওয়ার আগে তা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমার দুঃখ হয়েছিল, ওই জীবনকে আমি আমার এতো খানি আকাঙ্ক্ষা আর অল্পবিস্তর সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জানতেন আমার রাজনৈতিক পদ গ্রহণে আপত্তি আছে। কিন্তু অনুভব করতেন, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা যে রকম জ্বলন্ত রূপ নিয়েছে, তার গভর্নর পদে এমন ব্যক্তির দরকার যার দেশের এই অংশ সম্পর্কে আগের থেকে অভিজ্ঞতা আছে। উনি বলেছিলেন, আমার উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর বাংলার লোকদের সম্পর্কে আমার সহানুভূতিশীল কর্মপ্রণালী মূল্যবান পুঁজি। কেননা তার সরকারের নীতি আর লক্ষ্য, আগামী দিনগুলোতে ওখানকার মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে হবে। আমাকে এইভাবে রাজি করানো হয়েছিল। আমি জনগণের কাজ মনে করে এই নিয়োগে রাজি হই।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো—পুলিশ ও ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলস আইয়ুব সরকারের শেষ দিনগুলোতে কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের প্রশাসন,

যা অতিরিক্ত খারাপ সব রাজনৈতিক লোকজন সৃষ্টি করেছিল, তাদের সেবা করতে গিয়ে ওই সব প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি 'গণ-বিরোধী' হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ বাহিনী তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল এবং খুব সহজে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিশালীর পক্ষ অবলম্বন করছিল সুবিচারের তোয়াক্কা না করে।

সিভিল সার্ভিসের সৎসাহস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার কার্যক্ষমতা ছিল না, স্ক্রিনিং, মামলা আর নয়া ব্যবস্থার ভয় এই সার্ভিসকে সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল।

বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা শহরে, সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন ও মিটিং-মিছিলকারীদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছিল। তাদের বিরুদ্ধে যে কঠোর পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল তার ভয়াবহ বিবরণ এখনো জনমনে জাগরুক রয়েছে। তাদের অপকর্ম আর বেইমানি নজিররূপে বিবেচিত হতো। তবু বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের প্রতিষ্ঠানই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে গ্রামীণ নির্মাণ-কর্মসূচিতে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছিল।

ছাত্ররা, যারা প্রায়শ রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল। তারা শক্তিশালী সশস্ত্র সব গ্রুপের মধ্যে ছিল। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল আওয়ামী লীগের দক্ষিণহস্ত ছাত্রলীগ। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ছাত্র সংগঠন ও জামাতে ইসলামীর ইসলামী ছাত্র সংঘ অন্য দুই ছাত্র সংগঠন ছিল।

সামরিক আইন জারি হলে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকে অবৈধ করা হয় না। রাজনৈতিক নেতাদেরও পাকড়াও করা হয় না। এতে প্রধান রাজনৈতিক নেতারা একেবারে দমে যান। তাঁরা আগের সরকারগুলোর বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁদের ধারণা ছিল তাঁরা সেই সময় ক্ষমতা লাভ করবেন। অন্যদিকে, চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের তৎপরতার উপর বিধিনিষেধ চাইছিলেন। এরা সব সময় চান, ঘটনা ঘটুক। তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইনের প্রয়োগ চাইছিলেন, যাতে তাঁরা গোপনে তাঁদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে পারেন। তাদের ধারণা ছিল সময় তাদের পক্ষে রয়েছে। তাঁদের বড় আশা ছিল বামপন্থীদের রাজনীতি জমে উঠবে।

প্রশাসন ব্যবস্থার দিক থেকে বাংলা সব সময় ছিল কঠিন প্রদেশ। ইতিহাসগত ভাবেই এখানে কয়েক দশক ধরে গোলযোগ চলে আসছিল। এই প্রদেশ চিরকাল রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আধুনিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্র ছিল। ভৌগোলিক ও মরশুমি অবস্থা, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এখানে ঘৃণা আর অনৈক্যচেতনার বীজ বপন করে রেখেছিল। এ পশ্চিমের বিরুদ্ধে পূর্বের ঘৃণাবিদ্বেষ ছিল না। এ স্থানীয়দের অ-স্থানীয়দের বিরুদ্ধে, চট্টগ্রামের মানুষের ঢাকার মানুষের বিরুদ্ধে, গরিবের ধনীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছিল না। সে সময়ের পরিস্থিতি হচ্ছে বাংলায় সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রিয়াশীল ছিল।

১৯৬৯-এর নভেম্বরে আমি সরকারকে সতর্ক করে দিলাম, ঘটনার অবনতি বেড়ে চলেছে, কঠিন সমস্যা সামনে। তখন পর্যন্ত সেনাবাহিনী খুবই ধৈর্য আর সহনশীলতা দেখিয়ে আসছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বললাম, আমি যে চিত্র দেখতে পাচ্ছি তাতে কয়েকটি বিষয়ই ভুল পথ অবলম্বন করছে। কোনো কোনো বিষয়

তো ভয়ানক ভুল দিকে ধাবিত হচ্ছে। ওই দিকে মিলিটারি আর জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে। এই রকম পরিস্থিতিতে সমস্ত দোষ সরকারের উপর গিয়ে পড়বে।

এছাড়া আরো কতকগুলো কারণে আমি জোর দিলাম, যতো শীঘ্র সম্ভব, সাধারণ নির্বাচন করতে হবে। আমার আগের পদের কার্যকালে আমি ধারণা দিয়েছিলাম, ১৯৭০-এর মার্চ মাস নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। তখন মনে করা হয়েছিল নির্বাচন তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আমি তখন আমার সহকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, উপমহাদেশের বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করতে ছ'মাস লেগেছিল।

১৯৬৯-এর পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে দুটি এমন ঘটনা ঘটে যাতে অসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য ফৌজ তলব করতে হলো। (১৯৬৯-এর নভেম্বরে ঢাকায় বাঙালি ও অবাঙালির দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দুটি অবাঙালি এলাকা মিরপুর আর মোহাম্মদপুর খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামরিক আইন জারির পর এই প্রথমবার ফৌজ তলব করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই ছাত্র আলম সলিম ও মন্টুর ওই দাঙ্গার পেছনে হাত ছিল। ওদের গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং সেইভাবে ওদের হিরো বানিয়ে দেওয়া হয়।) মিলিটারি ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সারা প্রদেশে বিরাট বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণা দ্রুত বেড়ে যায়। আমার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল মিলিটারির গুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা যেন ন্যূনতম থাকে। না হলে ফৌজি সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া তীব্র হতো এবং আমরা যে শুভেচ্ছা সৃষ্টি করতে চাইছিলাম তার উপর আঘাত পড়তো।

আমি এই কাজগুলোর দিকে প্রেসিডেন্টের মনোযোগ ফেরালাম এবং স্থির করলাম সেনাবাহিনীকে আস্তে আস্তে অ-সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করা হবে। সামরিক আইনের আবরণ থাকবে, কিন্তু সামরিক কর্মকর্তা আর সামরিক শক্তির ব্যবহার হবে সবচেয়ে কম। ১৯৭০-এর প্রথম দিকে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে বাধা তুলে নেওয়া হলো। রাজনৈতিক বিষয়গুলোর জন্য সামরিক আইনের অধ্যাদেশ ও আদেশগুলো জারি হতে লাগলো। রাজনীতির প্লাবনের ধারা যা দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল, দ্রুত ছাপিয়ে উঠলো এবং ঢাকনা উঠে যেতেই জনসভাগুলোতে হাঙ্গামা হতে লাগলো, তবে কোনো মারাত্মক ঘটনা দেখা গেল না। এই জোয়ারের শুরুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জনসমর্থন প্রমাণ হয়ে গেল এবং সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হতে লাগলো যে, আওয়ামী লীগের এই জাদুকরী শক্তির অধিকারী ওই নেতা ও ৬-দফা কর্মসূচি সম্পর্কে জনমনে বিরাট সমর্থন রয়েছে।

নির্বাচনী চাঞ্চল্যের এই মাসগুলোতে যখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা যার যার পার্টি প্রোগ্রাম ও ব্যক্তিগত সমর্থন অর্জনের জন্য প্রয়াস করে চলেছেন, তখন আমি আমার সর্বাধিক সততার সঙ্গে নিরপেক্ষ পন্থা অবলম্বন করে চললাম। আমি সরকারি কর্মকর্তাদেরও বললাম, তারা সরকারি দায়িত্ব পালনে ও নিজেদের ব্যাপারে যেন আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। আমি শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, খাজা খয়রুদ্দিন, প্রফেসর গোলাম আযম, খান সবুর খান, ওয়াহিদুজ্জামান, নূরুল আমীন ও অন্য কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে কমিটি গঠন

করলাম। একবার মওলানা মওদুদী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, আমি শেখ মুজিবের প্রতি পক্ষপাতী। কিন্তু প্রফেসর গোলাম আযমের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের জামাতে ইসলামী মওলানার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে। জামাতের নিজেদের যে কঠোর নিয়মকানুন ছিল তার আলোকে প্রফেসর গোলাম আযমের এই কথা আমার পক্ষে বড় স্বস্তির কারণ হয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান বা মেজর জেনারেল রাওফরমান আলিকে নিয়ে বা উভয়কে নিয়ে মিলিত হতাম। আমি তাদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করি। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রায় বলতাম, তিনি গভর্নরের দায়িত্ব আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিন। বাঙালি জাতীয়তার পরিবেশ দ্রুত উপচে পড়ছিল, আমি তার মধ্যে একলা কাজ করছিলাম। তাছাড়া আমার আলসার ছিল। উনি আমার ইস্তফা গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। সব সময় বলতেন, 'আমরা এক সঙ্গে ঘরে যাব।'

১৯৭০-এর মার্চে প্রেসিডেন্ট লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার মন্ত্রিপরিষদে পেশ করার আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নরদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেন। খসড়া রাওয়ালপিন্ডিতে তৈরি করা হয়েছিল, সেই বৈঠকে প্রথমবার সেই খসড়া আমি দেখলাম। আমি অভিমত দিই যে, লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে সমগ্র নির্বাচন প্রসঙ্গে ন্যূনতম ধারা রাখা হোক আর এক ইউনিট বিলোপ করার মতো বিতর্কমূলক বিষয় ওতে না রাখা হোক। আমার মতে সে সময় সামরিক সরকারের পক্ষে এক ইউনিটের মতো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত করা সুবিবেচনার কাজ হতো না। তাতে মানুষের আবেগ-অনুভূতি উত্তেজিত হয়ে পড়তো। আমার এই ধারণা দুই কারণে বাতিল করে দেওয়া হয়। প্রথমত, যদি সাধারণ নির্বাচনের আগে ওয়ান-ইউনিট ভাঙা না হয় তাহলে তা এক মস্ত নির্বাচনী প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট প্রদেশগুলো এক ইউনিটের কট্টর বিরোধী হয়ে উঠবে। অনুরূপভাবে এও মনে হলো, যদি সাধারণ নির্বাচনের আগে এক ইউনিট না ভাঙা হয় তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান তাকে ভাঙতে সাহায্য করার মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট প্রদেশগুলোতে বিভেদ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন।

১৯৭০-এর জুনে বা তার কাছাকাছি সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুই জায়গাতেই কানাঘুষা শুনলাম, কিছু কিছু সামরিক আর অসামরিক লোকের ধারণা, প্রাদেশিক প্রশাসনগুলোর বেশি দ্রুত কাজ আদায় করা দরকার। কারণ এ সামরিক আইন প্রশাসন, তার শৃঙ্খলা ও শক্ত দখলের প্রকাশ দেখানো দরকার। বাস্তবে বিভিন্ন মতগোষ্ঠী যারা সামরিক আইনের কঠোরতর পক্ষে ছিল তারা তা এই কারণে ছিল যে, এ ব্যাপারে তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কোনো শিল্পপতি চাইছিলেন, শ্রমিকদের কঠোরভাবে দমন করতে ফৌজ ব্যবহার করা হোক। কোনো কোনো রাজনীতিবিদ চাইছিলেন, তাদের বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করতে ফৌজ সাহায্য করুক আর মার্শাল ল' আদেশ তাদের ব্যাপারগুলোর পক্ষাবলম্বন করুক। অন্য কথায়, নিজেদের বিশেষ বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনগণের সঙ্গে ফৌজের ভয়ানক সংঘর্ষ লেগে যাক তারা তাই চাইছিল।

কিছু লোক চাইছিল ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতি-পূজাকে পশ্চিম পাকিস্তান শক্ত হাতে ঠেকাক। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে তারা উপনিবেশের লোক বলে মনে করতো।

আমি প্রেসিডেন্ট আর পিএসওকে বললাম, যদি যুদ্ধবাজদের ধ্যান-ধারণা এই রকম হয়ে থাকে তাহলে আমি বুদ্ধি বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতে পারবো না। আমি মনে করতাম, কল্যাণের উদ্দেশ্য যদি না থাকে, কঠোরতার ফল ধ্বংসরূপে দেখা দেয়। আর কঠোরতা না থাকলে কল্যাণ দুর্বলতার রূপ নেয়। আমি এই সত্য অবশ্যই রেকর্ড করতে চাই, ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পিএসও লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসজিএমএম পীরজাদা আমার এই ধ্যানধারণার সম্মান করতেন আর প্রেসিডেন্ট তার প্রশংসা করতেন। ১৯৬৯-এর পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে যখন আমি গভর্নর নিযুক্ত হই আর ১৯৭১-এর পয়লা মার্চ যখন আমি নিষ্কৃতি পাই, আমি ওই ধ্যানধারণার প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলাম এবং সকল উপযুক্ত সুযোগে তার প্রচার করতাম। আমি একে আমার ঈমানের অংশ ও সব রকমের অবস্থায় সঠিক কর্মপদ্ধতি বলে মনে করি।

যদিও নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ, ১৯৭০-এর অক্টোবর, আমার ইচ্ছার চেয়ে দূরে ছিল, ওই তারিখও সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের কারণে মুলতবি করে দেওয়া হলো। প্রেসিডেন্ট ঢাকা এলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে এ বিষয়ে মতৈক্য হলো যে, এই মুলতবি তাদের পছন্দ নয়। তবু জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো ঘোরার পর তারা তাদের মত বদলালেন। এর মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের প্রথম প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর নির্বাচন স্থগিত করার বিরুদ্ধে খোলাখুলি বললেন। পরের সাক্ষাতে প্রেসিডেন্ট তাকে তার নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বললেন। শেখ মুজিবুর রহমান জবাবে বললেন, 'আপনার প্রথম নিশ্চয়তাদানের ভিত্তিতে আমি সাধারণ সভাগুলোতে মুলতবির বিরোধিতা করেছি। এখন যদি আপনি মুলতবির সিদ্ধান্ত করেন তাহলে লোকে আমাকে দোষ দেবে, বলবে, আমার আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাথাব্যথা নেই। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জীবন অর্ধেক পানিতেই কাটে। এ ব্যাপারে ভোটারদের কোনো অসুবিধা হবে না।'

তুফানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণে মানুষের মনে সন্দেহ জন্মায় যে, সূচি অনুযায়ী ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ নির্বাচন হবে না। ইয়াহিয়া খান এ সন্দেহ এই বলে দূর করার চেষ্টা করেন যে, নির্বাচন সূচি অনুযায়ীই হবে (১৯৭০-এর ২৯ নভেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলন।) জেনারেল ইয়াহিয়া চীন সফরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি ঢাকায় অল্প সময় থাকেন এবং ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত এলাকাগুলোর পরিমাপ নেওয়ার পর নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত করেন, শেখ মুজিব ও অন্য নেতারা যতো বলেন ততো ক্ষতি হয়নি। তিনি তাড়াহুড়ো করে ইসলামাবাদ চলে যান। তারপর হেলিকপ্টার পাঠাতে অনাবশ্যক দেরি করা হয়। সাহায্যের কাজের জন্য ওগুলোর জলদি দরকার ছিল। মুজিব এই অবস্থার পুরো ফায়দা উঠান। তার জন্য ইয়াহিয়াকে ঢাকা ফিরে এসে কয়েকদিন ওখানে থাকতে হয়। কিন্তু তার মধ্যে পূব পাকিস্তানের সঙ্গে কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক ব্যবহার তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যখন পূর্ব কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল ইয়াকুবের কাছে আমি ত্রাণকার্যের জন্য সেনাবাহিনীর সেবা প্রদানের কথা বললাম, তিনি জবাব দিলেন, তার কাছে 'ফালতু খরচ' নেই। তার সেনাদল

সামরিক কাজের এলাকাগুলোতে ছিল, তাদের সেখান থেকে তুলে আনা যাচ্ছিল না। তার বক্তব্য ছিল, নিযুক্ত সৈন্যদের যদি এঁদিক-ওদিক করা হয় 'বিড়াল কবুতর লোপাট করে দেবে।' জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আসন লাভ করেছিল।

নির্বাচন সম্পূর্ণ হতেই আমি পিএসওকে টেলিফোনে বললাম, তিনি জেড এ ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমানকে রাওয়ালপিন্ডিতে আমন্ত্রণ জানানোর সম্ভাবনা যেন পরীক্ষা করে দেখেন যাতে ওই দুজনকে নিয়ে ব্যাপক সরকার গঠনের বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা যায়। ১৯৭১-এর জানুয়ারির প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে এলেন। একদিন পিএসও আমার অফিসে এসে বললেন, আমি আওয়ামী লীগের ৬-দফা একটু দেখবো। ওই দলিলটি আনার ব্যবস্থা হচ্ছিলো, আমি তাকে তার আসার উদ্দেশ্য কী জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহকর্মীদের কাল সাক্ষাৎ হচ্ছে। ওতে ৬-দফা সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। আপনিও আমন্ত্রিত।' আমি পিএসওর কাছে জানতে চাইলাম, ৬-দফা সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত বিবরণ তৈরি করা হয়েছে, ওর ক্ষতিকর বা খারাপ দিক সম্পর্কে কি উল্লেখ করা হয়েছে যাতে প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করে খুব বেশি দরকারি বিষয়গুলো সম্বন্ধে তাদের জবাব পেতে পারেন? পিএসও বললেন, এমন কোনো পর্যালোচনা তৈরি করা হয়নি। এটা প্রাথমিক বৈঠক হবে। বিস্তৃত আলোচনা পরের সাক্ষাৎগুলোতে হবে।

পরদিন ঢাকার প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদে সভা হলো। সেখানে প্রেসিডেন্ট, পিএসও, আমি ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন : শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। আওয়ামী লীগের নেতারা ৬-দফার কর্মসূচি পেশ করেন এবং প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের জবাব দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চান : 'স্যার, আপনি জানেন ৬-দফা কর্মসূচি কী? আমাকে বলুন এই কর্মসূচি সম্পর্কে আপনার কী আপত্তি আছে?'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'শেখ সাহেব, ৬-দফা কর্মসূচি সম্পর্কে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনাকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।'

শেখ মুজিব বললেন, 'নিশ্চয় স্যার! মেহেরবানি করে অ্যাসেম্বলির অধিবেশন খুব জলদি আহ্বান করুন। আমার প্রস্তাব ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) ডাকুন। দেখবেন আমি কেবল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব না, বরং আমার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে।'

আমি বললাম : 'অ্যাসেম্বলিতে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনের কথা না ভাবা হলে সংবিধান বুলজোজ্ড হয়ে যেতে পারে।'

শেখ মুজিব বললেন : 'না, না, আমি ডেমোক্র্যাট এবং সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর নেতা। আমি পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপার উপেক্ষা করতে পারি না। আমি কেবল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছে নয়, বরং বিশ্বের জনমতের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। আমি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী যে কোনো কাজ করবো। (এখানে

অস্পষ্ট মুদ্রণের কারণে একটি পঙ্‌ক্তি ভালো পড়া যায় না। কিন্তু বোঝা যায়, শেখ মুজিব অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে প্রেসিডেন্টকে আওয়ামী লীগ প্রণীত সংবিধানের খসড়া দেখাবেন বলেছিলেন—অনুবাদক) যদি আপনার আপত্তি থাকে, আমি আপনার ইচ্ছা মোতাবেক যা করার করবো। সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির নেতারূপে আমি অ্যাসেম্বলিতে প্রদেয় প্রেসিডেন্টের ভাষণের খসড়া তৈরি করবো। আমি অ্যাসেম্বলির ভিতরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব যে, আপনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন। তারপর আমরা গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের পক্ষে যা জরুরি তার সমস্ত করবো। আমরা সাবজেক্ট কমিটিগুলো বানাবো। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করবো এবং অ্যাসেম্বলির ভিতরে ও বাইরে বাস্তবায়নযোগ্য ফর্মুলা খুঁজে দেখবো।'

সংবিধান প্রণয়নের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আরো মত প্রকাশের পর শেখ মুজিবুর রহমান বললেন : 'স্যার, আমার পার্টি আপনাকে পাকিস্তানের আগামী নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচন করতে চায়। এ খুব বড়ো সম্মান এবং আমরা মনে করি, দেশে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আপনি এই সম্মানের সম্পূর্ণ অধিকারী।'

প্রেসিডেন্ট উত্তর দিলেন : 'আমি এক সহজ-সরল সৈনিক। আমি ব্যারাকে, না হয় ঘরে ফিরে যাবো। আমি আমার মৌলিক দায়িত্ব পালন করবো।'

শেখ মুজিব বললেন, 'না, স্যার, আমরা আপনাকে এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করতে দেবো না। জাতি যখন আপনার সেবার দাবি করছে, আপনি তা অস্বীকার করতে পারেন না।'

হালকা সুরে আরো কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট স্মরণ করিয়ে দিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল পিপলস পার্টির সঙ্গে মিলে কাজ করার কতোখানি গুরুত্ব রয়েছে?

শেখ মুজিব উত্তরে বললেন : 'আমি সত্যিই পিপলস পার্টির সাহায্য চাইবো। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও চাইবো।'

তিনি বললেন, 'আমার মোটেই এ ইচ্ছা নয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর সমস্যাবলী সম্পর্কে আমি কোনো সমাধান চাপিয়ে দেবো। আমার মনে হয়, তারা পূর্ব পাকিস্তানের মতো স্বশাসন চান না। তারা এতোখানি স্বশাসন পেতেও পারেন না। প্রয়োজন পড়লে আমি সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি এমন কোনো ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করবো না যা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক নেতার দখলে থাকে।'

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের প্রতি আবার আবেদন জানান, তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ১৫ ফেব্রুয়ারি ডাকুন। কেননা জনগণ অধৈর্য প্রকাশ করছেন, সময় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, আর অনেক কিছু কাজও করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন, যতো শীঘ্র সম্ভব তিনি তা করবেন। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে এও বললেন যে, ফিরে গিয়ে শিকার করতে তিনি লারকানা যাচ্ছেন। সেখানে তিনি ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি বললেন, গভর্নরকে যাবতীয় জরুরি বিষয়ে পরামর্শের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত করলেন যে, সামগ্রিক ব্যবস্থাবলীর জন্য আওয়ামী লীগের মুখপাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো যায়। তাজউদ্দিন আহমদ ও ডঃ কামাল হোসেনকে গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য নির্ধারণ করা হলো।

সেই রাত্রেই প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদে কিছু সামরিক অফিসার প্রস্তাব করলেন, প্রেসিডেন্টকে কেবল প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচিত করা নয়, তাকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ বা সুপ্রিম কমান্ডারও থাকতে হবে, দেখনধারী নয়, বরং কার্যকরভাবে। প্রেসিডেন্ট নিজে তো চুপ করে থাকলেন, কিন্তু আমি বললাম, আমার মত হচ্ছে নির্বাচিত নেতার পক্ষে ওই পদ গ্রহণ করা বুদ্ধিহীন কাজ হবে। প্রেসিডেন্টের পক্ষে ভালো হবে তিনি যেন সম্মানের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন, প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ না করেন। ইতিহাসে তাকে এই বলে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হবে যে, মাত্র কয়েকজনের মধ্যে তিনিও ক্ষমতা নিজে হস্তান্তর করেছেন এবং এমন ক্ষমতা গ্রহণ করেননি যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় আমি প্রেসিডেন্টকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডাকতে দেরি করার ব্যাপারে আমার উদ্বেগ প্রকাশ করি। লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে কিছু বলা ছিল না ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন কতোদিনের মধ্যে ডাকতে হবে। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'শেখ মুজিব চাইছেন অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ১৫ ফেব্রুয়ারি ডাকা হোক। ভুট্টো চাইছেন মার্চে অধিবেশন হোক। আমি এই তারিখগুলো পরীক্ষা করে দেখবো, আর ঈদের পর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডাকবো।'

প্রেসিডেন্টকে বিদায় দেয়ার পর আমার মনে হলো সন্দেহ আর বিভ্রান্তির দিন শীঘ্র শেষ হতে যাচ্ছে। মনে হলো, বোঝা হালকা হয়ে গেছে। আমি অন্তর থেকে উপলব্ধি করছিলাম প্রেসিডেন্ট বিশুদ্ধ মনে কথাগুলো বলেছেন। প্রেসিডেন্ট, তাঁর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার আর আমার অভিমত এ ব্যাপারে অভিন্ন ছিল যে, সেনাবাহিনীকে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলী থেকে আলাদা করা চাই, যাতে তারা বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রস্তুতির মৌলিক দায়িত্বের ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট লারকানায় শিকার করতে গিয়েছিলেন। তার একটি ছবি ছাপা হয় যাতে তিনি সিনিয়র ফৌজি অফিসারদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওই ছবিতে এমনিতে অন্য কিছু ছিল না। কিন্তু ঢাকায় এই ছবিটা সন্দেহ আর কল্প-কাহিনীর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। লোকে একটা চক্রান্তের কথা বলছিল। বলছিল, আওয়ামী লীগকে ৬-দফা থেকে হটাবার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন আহ্বান করতে দেরি করা হবে। আমার ভালো করে জানা ছিল যে, ঈদের পর প্রেসিডেন্ট অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডাকছেন। আমি ওইসব গুজব পুরোপুরি বাতিল করে দিচ্ছিলাম।

পরে, ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে জেড এ ভুট্টো তাঁর পিপলস্ পার্টির সহকর্মীদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সফর করলেন এবং শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। মিস্টার ভুট্টো তুফানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোও ঘুরে দেখলেন এবং অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। উনি আমাকে বললেন, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর তৈরির কাজ দ্রুত যেন শেষ করি। বাঁশ পেতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে এ কাজ দ্রুত এগুচ্ছিল না।

মিস্টার ভুট্টো চলে গেলে শেখ মুজিব আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক ও অসামরিক বিষয়াবলীর মেজর-জেনারেলও ওই সময়

উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব বললেন, মিস্টার ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর আলোচনায় কোনো ফল পাওয়া যায়নি। পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান আরো বিস্তৃত আলোচনার জন্য এখানে আর একবার সফর করবেন। শেখ মুজিব আমাকে বললেন, তিনি যেন গণপরিষদের অধিবেশন জলদি আহ্বান করার জন্য প্রেসিডেন্টকে জোর দিয়ে বলেন।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব আর তাঁর সহকর্মীদের তাঁর ব্যক্তিগত অতিথিরূপে রাওয়ালপিন্ডি আসার আমন্ত্রণ করেন। আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলি আর প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে তাঁকে লিখিত আমন্ত্রণপত্র দিই। শেখ মুজিব ওইসময় পশ্চিম পাকিস্তান সফর করতে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন, কেননা, তাঁর কথামতো, তিনি আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোর সদস্যদের সম্মেলন ডেকে রেখেছিলেন। সামরিক আইন প্রশাসক ও আমি তাঁকে জোর দিয়ে বললাম, তিনি যেন তাঁর সুবিধামতো যথাশীঘ্র এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

আমি প্রেসিডেন্টকে জানালাম, সামরিক আইন প্রশাসক ও আমি শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে রাজি করাতে পারিনি। আমি এও বললাম, অ্যাসেম্বলির জাতীয় ও প্রাদেশিক সদস্যদের সম্মেলন শীঘ্র হতে যাচ্ছে। বললাম, এই কি সঠিক হবে না, আওয়াজ উচ্চ হওয়ার আগেই তারিখ নির্ধারণ করা হয়? যখন ১৯৭১-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হলো ৩ মার্চ অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডাকা হয়েছে, আমি ভারি স্বস্তি বোধ করলাম। কয়েকদিন পর প্রেসিডেন্টের একটা তার পেলাম, তাতে আমি উদ্বেগে অস্থির হয়ে পড়লাম। সরকারের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমার বিশ্বাস তো একেবারে নাড়া খেয়ে গেলো। টেলিগ্রাম কিছুটা এইরকম ছিল : 'শেখ মুজিবকে বলবেন, রাওয়ালপিন্ডি সফরের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করায় আমি ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করেছি। যদি তিনি যথাশীঘ্র রাওয়ালপিন্ডি আসার ব্যবস্থা করতে না পারেন তবে তার ফলে যে সঙ্গিন অবস্থা দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে তার সমস্ত দায়িত্ব তাঁদেরকেই নিতে হবে।'

আমাকে বলা হলো, আমি যেন শেখ মুজিবকে টেলিগ্রাম পড়ে শোনাই এবং 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে তাঁকে টেলিগ্রাম দিই। আমি পিএসও-কে টেলিফোন করে এই টেলিগ্রামের ভাষা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করলাম। বললাম, এই বার্তা পাওয়ার পর যদি শেখ মুজিবের মনোকষ্ট হয়, তিনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন তাঁদের রাওয়ালপিন্ডি যেতে বলার উদ্দেশ্য কী। কিন্তু পিএসও এ কথার কোনো জবাব দিলেন না, বললেন, আমি যেন টেলিগ্রামের নির্দেশ মতো কাজ করি।

আমি শেখ মুজিব, সামরিক আইন প্রশাসক ও সামরিক বিষয়াবলীর মেজর-জেনারেলকে সাক্ষাতের জন্য ডাকলাম। এটা ওটা প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমি আলোচনার দিকে যাচ্ছিলাম, আমাকে একটা অন্য কামরায় ডাকা হলো। কারণ রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ থেকে টেলিফোনে আমার ডাক এসেছে। আমার কাছে জানতে চাওয়া হলো আমি শেখ মুজিবকে টেলিগ্রাম পড়ে শুনিয়েছি কিনা, কবে শুনিয়েছি? আমি বললাম, 'এখন থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে শোনাতে যাচ্ছি।' তাতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো, ওই রাত পর্যন্ত ওই বার্তা আটকে রাখা হোক। আমার পক্ষে এটা ছিল বিচিত্র এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। অতএব আমি তাড়াতাড়ি পিন্ডিতে পিএসও-কে ফোন

করলাম, ওই বার্তার যথার্থতা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। পিএসও নিজেও অবাক হলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যথার্থতা যাচাই করে তিনি আমাকে জবাবি টেলিফোন করে জানালেন, সত্যি ওই বার্তা আটকে রাখতে হবে।

১৯৭১-এর ২২ ফেব্রুয়ারির দিকে আমাকে গভর্নর আর সামরিক আইন প্রশাসকদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হলো। রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছালে আমি ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। সামরিক তৎপরতা শুরু হয়েছে দেখা গেলো। মন্ত্রিপরিষদ বাতিল হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি বিমান সার্ভিস বন্ধ হয়েছে, জলপথে সরঞ্জাম যাচ্ছে। পিন্ডিতে 'পরিকল্পনা মোতাবেক সামরিক সমাধানের' খোলাখুলি কথাবার্তা হচ্ছে। এই পরিবেশে আমার বড়ো তাজ্জব লাগলো, কোনো সামরিক পরিকল্পনা বা কোনো সামরিক সমাধান সম্পর্কে কিছুই আমার জানা ছিল না।

২২ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট গভর্নর আর সামরিক আইন প্রশাসকদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। ওতে তিনি যথারীতি ইনটেলিজেন্স এজেন্সিগুলোকে ইশারা দিলেন, তাঁরা যেন শেখ মুজিব আর ৬-দফার খবর নেন। তাঁদেরকেই সমস্ত রাজনৈতিক খারাবির জন্য দায়ী বানালেন তিনি। যখন ওই সব বোলচালের আওয়াজ একটু নিচু হলো তো আমি অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, ৬-দফা কোনো নতুন জিনিস নয়, তা হঠাৎ দেখা দেয়নি। বলতেই প্রেসিডেন্ট উঠে পড়লেন। তারপর জেনারেল হামিদ, লে. জেনারেল পীরজাদা, লে. জেনারেল ইয়াকুব আর আমাকে আলাদা এক কামরায় নিয়ে গেলেন। ছোট সেই কামরায় আমরা বসলে প্রেসিডেন্ট আবার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে আমাদের অ্যাসেম্বলির অধিবেশন স্থগিত করার তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন, যাতে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের দুই বড়ো রাজনৈতিক দল অ্যাসেম্বলির বাইরে নিজেদের বিরোধগুলি দূর করার সুযোগ পায়। আমি তাঁকে বললাম, অ্যাসেম্বলির অধিবেশন মুলতবি করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে যার ফলে বিরাট আকারে অশান্তি ও প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা দেবে। বস্তুত, চক্ষুষ্মান যে কোনো ব্যক্তিই সহজে দেখতে পাচ্ছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমানই এই ব্যাপারের শেষ বাঙালি যাঁর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান কথা বলতে পারতো ও কোনো একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে পারতো। বাংলার নৌজোয়ান যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কালে বয়সে খুব ছোট ছিল তারা বড়োই হয়ে উঠেছিল ঘৃণা আর অপমানের মধ্যে। অবশিষ্ট দেশের প্রতি তাদের কোনো ভালবাসা ও সৌহার্দ্য ছিল না।

প্রেসিডেন্ট মত প্রকাশ করলেন যে, আমার ধ্যানধারণা অবশ্যই খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে, কেননা অ্যাসেম্বলির অধিবেশন মুলতবি করার সঙ্গে তিনি দুটি বড়ো কাজ করতে যাচ্ছিলেন : তিনি গভর্নর ও মুখ্য (চিফ) সামরিক আইন প্রশাসকের দুই পৃথক পৃথক বিভাগকে এক করছিলেন। আমার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার আগে ওই দুই বিভাগ আলাদা ছিল। তিনি সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ ও কঠোর সামরিক আইন প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলেন। পয়লা মার্চ ১৯৭১ উনি ওই মুলতবির কথা ঘোষণা করবেন আর শেখ মুজিবকে তার মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আগে সে খবর জানাবেন। পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছে আর আমার যথাসাধ্য চেষ্টা বরবাদ হওয়ার পর শেখ মুজিবকে আমাকে যা বলতে

হবে তা এই যে, তিনি যেন মাথা ঠিক রেখে কাজ করেন। আমি লক্ষ্য করলাম, প্রেসিডেন্ট একবারও আমার চোখে চোখ রেখে কথা বললেন না।

যখন আমি ২৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে গেলাম, ওখানে অসন্তোষ ও উত্তেজনা অসহনীয় চলছিল। আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, পরস্পর সম্মত হয়ে সাংবাদিকদের থেকে বাঁচার জন্য এক গোপন স্থানে মিলিত হলাম। শেখ মুজিবকে আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির অধিবেশন মুলতবি করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের উপর খুব বেশি চাপ রয়েছে। এরপর জরুরি ছিল তিনি দ্রুত রাওয়ালপিন্ডি গিয়ে দেখা করেন। এও খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল, সীমিতভাবে হলেও, পশ্চিম পাকিস্তানের আবেগ-অনুভূতির কথা ভেবে তিনি অন্তত বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রশ্নে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে ছাড় দেন এবং কিছু আলোচনা করুন। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, কেবল তিনিই রয়েছেন যিনি এখনো পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। শেখ মুজিব বিচলিত, হতবুদ্ধি হয়ে থাকলেন কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তিনি ধমককে ডরান না, আর বাংলার জনগণকে তিনি ধোকা দেবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকেও তিনি কম ভালোবাসেন না। তিনি তাঁর পার্টিকে ওখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। কিন্তু এই সরকার পীর পাগারোর কাছে ইনটেলিজেন্স অফিসারদের পাঠিয়ে তাঁকে হুমকি দিয়ে বলেছে, তিনি যেন আওয়ামী লীগের সমর্থন ছেড়ে দেন। (পরের দু-তিনদিন যেন আমার ভয়ানক দুঃস্বপ্নে কাটলো। প্রেসিডেন্ট যা চাইছিলেন এখনো যেন তা আমার বিশ্বাস হয় না। উনি কী করতে চাইছিলেন উনি ছাড়া আর কেউ তা জানতো না। আমার এমন মনে হচ্ছিল, আমার এখন এমন কোনো সহমর্মী নেই যাকে আমার মনের কথা খুলে বলি। তাই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমি এক জরুরি টেলিগ্রাম পাঠালাম। জানালাম, তিনি যদি অ্যাসেম্বলির অধিবেশন মুলতবি করেন তাহলে কঠিন অশান্তির সৃষ্টি হবে যা নিযন্ত্রণ করা অসামরিক প্রশাসনের পক্ষে অসম্ভব হবে।)

১৯৭১-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি, ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা আগে, আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকলাম। তিনি তাজউদ্দিন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। শেখ মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী, মুলতবি অনির্দিষ্টকালর জন্য নাকি?' উত্তরে আমি বললাম, 'তাই তো মনে হয়।'

আমি তাঁকে আশ্বাস দিতে চাইলাম মুলতবি অল্পদিনের জন্য হবে। তিনি তাঁর জবাবে যা বললেন তার সারকথা ছিল এই যে, তাঁকে যে কেবল ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে তা নয়, বরং পাকিস্তানকেও ধ্বংস করা হচ্ছে। ইতিহাস বলে দেবে কে অপরাধী। পরিস্থিতির জন্য আমাকে দায়ী করা হবে না।

১৯৭১-এর পয়লা মার্চ অধিবেশন মুলতবি করার ঘোষণা হয়ে গেলো। যেহেতু প্রেসিডেন্ট নিজে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেননি তাই কেউ কেউ মনে করলো জেনারেল ইয়াহিয়াকে বাধ্য করা হয়েছে এবং অন্য সামরিক জান্তা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। ২৮ তারিখের পুরো রাত আর এক তারিখের সকাল বেলা আমি টেলিফোনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁকে পেলাম না। কিংবা তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন না। আমি আমার শেষ টেলিগ্রাম পাঠালাম : "আমি আপনার কাছে

আবেদন করছি যে, শেষ মুহূর্তেও যদি হয়, অ্যাসেম্বলির অধিবেশন আহ্বানের নতুন তারিখ জানিয়ে দিন। অনির্দিষ্টকালের জন্য তা মুলতবি রাখবেন না। তা না হলে আমার পক্ষে ফেরার পথ অবশিষ্ট থাকবে না।"

আমি প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের সঙ্গে, যিনি পিণ্ডিতে ছিলেন, একাধিকবার কথা বললাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রেসিডেন্ট করাচিতে ছিলেন। মেজর জেনারেল উমর আমাকে বললেন, প্রেসিডেন্ট ব্যস্ত আছেন। বললেন, আমার বার্তা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। শেষে আমি জেনারেল হামিদের সঙ্গে পরিস্থিতির গভীরতা সম্পর্কে কথা বললাম। তিনি বললেন, তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানেন না। তবু তিনি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন।

এই সময়ে শেখ মুজিব তাঁর এক দূত আমার কাছে পাঠালেন। যিনি বললেন, "যা কিছু ঘটুক না কেন, পদত্যাগ করবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আপনিই একমাত্র সংযোগ রয়েছেন। যদি আপনি চলে যান, আমরা আর কারো সঙ্গে কথা বলবো না।"

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজির কথা

[বিচারপতি হামুদুর রহমানকে লেখা জেনারেল নিয়াজির এই পত্র ভাষা ও ভাবের কোনো পরিবর্তন ও সংশোধন না করে প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে বিন্দুমাত্র অন্যরকম না হয়।]

জনাব হামুদুর রহমান সাহেব!

আস্সালামো আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর ফজলে আপনি কুশলে আছেন। জজ সাহেব! দৈনিক 'নওয়ায়ে ওয়াকত'-এর ৬ জুলাইয়ের সংখ্যায় আপনার বক্তব্য ছাপা হয়েছে যাতে আপনি এই কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, কমিশন, যার আপনি প্রধান ছিলেন, জেনারেল ইয়াহিয়া ও আমার (জেনারেল নিয়াজির) বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর সুপারিশ করেছিল। কমিশনের রিপোর্ট যেহেতু এখন পর্যন্ত জনসমক্ষে আসেনি, তাই আপনার এই বক্তব্য সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। কমিশনের বিস্তৃত রিপোর্ট বর্তমানে অপ্রকাশ্য ও গোপন রয়েছে। তাই আপনার পক্ষে বিবেচনাপ্রসূত ছিল না কমিশন জেনারেল ইয়াহিয়া আর জেনারেল নিয়াজির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর সুপারিশ করেছিল কেবল এইটুকু প্রকাশ করা। এই ধরনের প্রকাশের পক্ষে এ কোনো উপযুক্ত উপলক্ষও ছিল না। আপনি কোনো রাজনীতিবিদ নন, বরং সরকারি কর্মচারী। কোনো অনুষ্ঠানে যদি আপনার কাছে জানতে চাওয়াও হতো তবু আপনার পক্ষে জবাব দেওয়া আবশ্যকীয় ছিল না। কমিশনের রিপোর্ট জনসাধারণের সামনে না আসার কারণে আপনার এই বক্তব্যের পরিণামে আমার বিরুদ্ধে যাবতীয় রকমের ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কমিশনের রিপোর্টের পুরো বয়ান যদি ধরা হয় তো কমপক্ষে তার দুটি অংশ, যার ভিত্তিতে মোকদ্দমা চালাবার সুপরিশ করা হয়েছে, সর্বসাধারণের সামনে তা রাখা উচিত ছিল। কেননা আপনি ভুট্টোর কালে আর একটি কমিশনের প্রধানরূপে খান আবদুল ওয়ালি খানের বিরুদ্ধে যে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার কথাও সবাই জানেন। আর তার জন্য যে হইচই হয়েছিল তাও সবার মনে আছে। সে বিষয়ে যে জনমত ছিল তাও সবাই জানেন।

আমি আপনাকে কেবল এই প্রশ্নটুকু করতে চাই, আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানের পতন রাজনৈতিক পরাজয়ের পরিণাম না সামরিক পরাজয়ের পরিণাম ছিল? সে সম্পর্কেও সর্বসাধারণকে অবহিত করা জরুরি। যদি রাজনৈতিক পরাজয় হয়ে থাকে তার অভিঘাত কী? আর তার জন্য কে কে দায়ী ছিল? কমিশন তার রিপোর্টে সে সম্পর্কে যে মত প্রকাশ

করেছিল তা জনসমক্ষে আসা দরকার। যদি কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকে যে, ঢাকার পতন সামরিক পরাজয়ের ফল তাহলে কি তার জন্য কেবল আমি আর জেনারেল ইয়াহিয়া খান দায়ী ছিলেন, না আরো ব্যক্তিকে দায়ী সাব্যস্ত করা হয়েছিল?

গোড়ার দিকে আমার কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ এই জন্য হয়নি যে, আমি ভারতে সামরিক বন্দীরূপে বন্দী ছিলাম। আর কমিশন তার রিপোর্ট সেই সব ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর তৈরি করেছেন ও সিদ্ধান্ত টেনেছেন যাঁদেরকে অযোগ্যতা, ভীরুতা বা অন্য কোনো গূঢ় অপরাধের জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে তো পরে শূন্যপূরণ আর দুনিয়ার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। সব সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছিল।

জজ সাহেব, এখন কিছু প্রশ্ন আছে। অনুগ্রহ করে এগুলোর উত্তর অবশ্য দেবেন। সেগুলো পড়ে বহু বহু লোকের ভালো হবে।

১। আমার ও জেনারেল ইয়াহিয়ার ব্যাপারে তো আপনার রায় প্রকাশ করেছেন। আপনার রিপোর্টে জেনারেল টিক্কা খান (বেলুচিস্তানের কসাই আর পূর্ব পাকিস্তানের কসাই), অ্যাডমিরাল আহসান, জেনারেল ইয়াকুব, জেনারেল পিরজাদা, জেনারেল ফরমান, জেনারেল গুল হাসান, জেনারেল কমর, এয়ার-মার্শাল রহিম খান, অ্যাডমিরাল মোজাফফর, ভুট্টো, মুজিব এবং এম এম আহমদের ব্যাপারে কী লিখেছেন?

২। আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানের পতন কি আকস্মিক ঘটনারূপে ঘটেছিল? নাকি সুচিন্তিত পরিকল্পনা আর চক্রান্ত অনুযায়ী হয়েছিল? কে কে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন? ৩। ইয়াহিয়া খানের উল্লেখ আপনি কমান্ডার-ইন-চিফরূপে করেছেন, না রাষ্ট্র ও অসামরিক শাসনব্যবস্থার প্রধানরূপে করেছেন? আর কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও মোকদ্দমা কেন চালানো হলো না? সেই অনুযায়ী, ইয়াহিয়া খান দুই পেনশন নিয়ে চলেছেন: এক জেনারেলের আর এক প্রেসিডেন্টের। আল্লার দোহাই, জাতিকে বলুন, তিনি কি এর হকদার?

৪। আপনার অর্থাৎ কমিশনের কাজ ছিল সরকারের কাছে ঘটনাবলীর রিপোর্ট পেশ করা, না আদালতের মতো শাস্তির সিদ্ধান্ত শোনানো? আপনার রিপোর্ট যখন সরকার যথাবিধি গ্রহণই করেননি, তখন বয়ান প্রকাশ করা কি আপনি যথার্থ বলে মনে করেন? তা কি একেবারে অনভিপ্রেত নয়?

৫। এই কথা আপনি কমিশনের প্রধানরূপে বলেছেন, না একজন পাকিস্তানিরূপে? না একজন স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিরূপে বলেছেন? সরকারি কর্মচারীরূপে এই বক্তব্য দেওয়া কি আপনার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে?

৬। পূর্ব পাকিস্তানের পতন ছিল জাতীয় ট্রাজেডি। কমিশনকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা কি সেই ট্রাজেডির সমস্ত দিক জানার পক্ষে যথেষ্ট ছিল? যদি অযেথষ্ট থেকে থাকে (আসলে যথেষ্ট অযথেষ্ট ছিল) তাহলে কি আপনি সে কথা প্রকাশ করেছিলেন?

৭। রিপোর্টে আপনি ও অন্যান্য সদস্য কি স্বাধীনভাবে আপনাদের অভিমত প্রকাশ

করেছেন? না কি আপনাদের দিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে? এবং তাতে রদবদল করা হয়েছে?

৮। যখন রিপোর্টের মূল কপি ভুট্টো আপনার কাছ থেকে নিয়েছিলেন, আপনি কি জাতিকে যথাসময়ে জানিয়েছিলেন যে, আপনার কপি উনি নিয়ে গেলেন এবং রিপোর্টে রদবদল হচ্ছে? এ ব্যাপারে আপনি চুপ ছিলেন কেন? প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে আপনি ওই কপি দিতে অস্বীকার করলেন না কেন? আপনার কাছ থেকে ওই কপি কি ভয় দেখিয়ে, ধমক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? নাকি আপনি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন এবং চুপ করে ছিলেন? নাকি আর কোনো ভালো উদ্দেশ্য আপনার সামনে ছিল?

৯। ভুট্টো তার গদি বাঁচানোর জন্য নির্বাচনে কারচুপি করার উদ্দেশ্যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সরকারি পদের জন্য বাছাই করেন। কী, আপনার বাছাইও সেইভাবে হয়নি? কমিশনে কি বহু ফালতু লোক ছিল না, যাদের থাকা উচিত ছিল না? তাদের থাকার কারণে আপনি কি রিপোর্ট গোপন রাখতে পারতেন এবং স্বাধীনভাবে মত দিতে পারতেন?

১০। ৭ জুলাইয়ের 'নওয়ায়ে ওয়াকতে' জেনারেল টিক্কা খান বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের পতনের সঙ্গে যে সব ব্যক্তি জড়িত তাদের মুখোশ খুলে ফেলা হোক? তার এই বীরত্বপূর্ণ বয়ান থেকে প্রকাশ পায়, কমিশন ভুট্টো আর টিক্কাকে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের জন্য দায়ী মনে করেনি। এর থেকে কি আপনার কমিশনের রিপোর্টের গুরুত্ব আর সততার আন্দাজ করা যায় না?

১১। আমি আপনাকে ছোটমতো একটা পরামর্শ দিচ্ছি। যদি আপনি সেই মতো কাজ করেন তাহলে আপনার ও দেশের কল্যাণ হবে। আপনি সরকারের কর্মচারী, না রাজনীতিবিদ? আপনি রাজনৈতিক মামলায় রায় জারি না করলেই ভালো হবে। আপনি বলেছেন, ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থার বেশি কাছাকাছি। এই নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। একে আবার মতভেদের বিষয় বানাবেন না। প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, আচ্ছা, এই কথা আপনি নিজে বলেছেন, না অন্যের কথামতো বলেছেন? উভয় ক্ষেত্রেই এ ভুল।

জনাব হামুদুর রহমান, খোদাকে ধন্যবাদ দিন আর পাকিস্তানকে দোয়া করুন যে, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ইচ্ছাগুলো জানা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে দায়িত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সেধে আনা হয়। আল্লার লাঠি নীরবে চলে। আল্লাহর কাজে দেরি হয়, অবিচার হয় না। অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তবাজ, চাটুকার, ঠিক সময়ে সবার পরিণাম খারাপই হয়। যেমন তাদের উত্থান হয় বিস্ময়কর, তেমনি তাদের পতনও হয় ভয়ঙ্কর। ভুট্টো আর টিক্কা খান আর তাদের সঙ্গী-সাথীরা এই দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে জেনেশুনে যে অপদস্থ করিয়েছেন তা কারো কাছে গোপন নেই। তাদের কীভাবে মাফ করা যায়? তাদের হিসাব চুকিয়ে দিতে হবে। টিক্কা খান ও ভুট্টোর বক্তব্য থেকে এবং আপনার বাণী অনুযায়ী টিক্কা খান (নিজ গুণেই) এবং ভুট্টো নির্দোষ। এর থেকেই আপনার রিপোর্টের গুরুত্ব ও নিরপেক্ষতার পরিমাপ করা যায়।

১২। শেষে আরো একটু আবেদন এই যে, যেহেতু আপনি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা শুরু করেছেন তো আরো দু-একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন:

পূর্ব পাকিস্তানের ট্রাজেডির উল্লেখ যখনই হয়, পূর্বাঞ্চলের সীমাবদ্ধ ফৌজ আর তার কমান্ডারকে অভিযোগের কেন্দ্র বানানোর চেষ্টা করা হয়। আপনার কমিশনের রিপোর্টে কি পশ্চিমাঞ্চলের ফৌজের ক্রিয়াকলাপের হিসাবও নেওয়া হয়েছে?

এই যুদ্ধের সময় আমার কাছে অসম্পূর্ণ তিন ডিভিশন ফৌজ, ১৪টি পুরাতন উড়োজাহাজ, নৌবাহিনীর ৪টি গানবোট ছাড়া পাকিস্তানের আর সব সামরিক শক্তি পশ্চিম অঞ্চলে ছিল। কমান্ডার-ইন-চিফ ছাড়া তিন বাহিনীর প্রধান, তাছাড়া ডজনের হিসাবে জেনারেল, এয়ার মার্শাল, অ্যাডমিরাল উপস্থিত ছিলেন। ৬ কোটি জনগণ, দেশপ্রেমী জনগণ ছিলেন। পেছনে আফগানিস্তান ও ইরানের মুসলিম দেশগুলো ছিল। সরকার পুরোদস্তুর কাজ করছিল। সমস্ত যোগ্য রাজনীতিবিদরা বর্তমান ছিলেন। সমগ্র দেশের জন্য নীতি এখানে তৈরি হচ্ছিল। এখানেই সিদ্ধান্ত হচ্ছিল। এখান থেকে আদেশ জারি হচ্ছিল। ওই সমস্ত লোকের কি এই ট্রাজেডিতে কোনো অংশ নেই? এখানকার সব লোকই কি দায়িত্বজ্ঞানহীন? এখানে কি এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না যাতে করে পশ্চিমাঞ্চলে চাপ সৃষ্টি ক'রে, তাঁরা পরিপূর্ণ তৎপরতা চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারতেন? পূর্ব পাকিস্তান ছিল মাত্র একটি বাহু। বাকি ছিল মাথাসহ সমস্ত শরীর। প্রবচন অনুযায়ী, মাছের পচন ধরে মাথা থেকে। পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যদি পশ্চিমাঞ্চলের উপর আলো ফেলা হয় তাহলে আরো ভালোভাবে সত্য জানা যাবে। শেষে একথাও বলি: সমস্ত বাঙালি চলে গেলো, আপনিও চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গেলেন না কেন?

'হয় ক্ষুধার্ত হস্তীর সঙ্গে দোস্তি কোরো না, নয় ঘর তোলো যেখানে রয়েছে খাদ্য যথেষ্ট হাতির' (ফারসি কবিতা। —অনুবাদক)।

উত্তরের প্রতীক্ষায়

আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি

প্রাক্তন জেনাবেল অফিসার কমান্ডিং

ইস্টার্ন কমান্ড

১ শামি রোড, লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

ফৌজি জেনারেলদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো প্রসঙ্গে বিচারপতি হামুদুর রহমানের বক্তব্য

৫ জুলাই ১৯৭৯ পাকিস্তানের সাবেক চিফ জাস্টিস মিস্টার হামুদুর রহমান এ কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, ঢাকার পতনের ঘটনাবলী তদন্তকারী হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর সুপারিশ করা হয়েছিল। কোনো এক উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জুলফিকার আলী ভুট্টোও বলেছিলেন, তিনি ওই দুজনের বিরুদ্ধে মামলা চালাবেন।

জেনারেল টিক্কা খান তার একটি বক্তব্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জেনারেল নিয়াজি প্রসঙ্গে যে কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কে বিচারপতি হামুদুর রহমানকে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি এ বক্তব্য প্রকাশ করেন। ওই বক্তব্যে টিক্কা খান সেনাবাহিনীর উপর দোষারোপ করে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পতনের দায়দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর বর্তায়, আর এ ছিল সেনাবাহিনীর পরাজয়। এর উপর তার অভিমত প্রদান করতে গিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি বলেন, সে সময়ে টিক্কা খান নিজেও তো পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন, তার উপরও তো কিছু দায়িত্ব বর্তায়।

(দৈনিক 'নওয়ায়ে ওয়াক্ত্' : ৬ জুলাই ১৯৭৯)

রিপোর্ট প্রকাশ প্রসঙ্গে টিক্কা খানের বক্তব্য

৬ জুলাই ১৯৭৯ অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল টিক্কা খান দাবি করেন, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক, যাতে করে জানা যাবে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের দায়দায়িত্ব কার উপর বর্তায়। তিনি এই অভিযোগ বাতিল করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পতনের দায়দায়িত্ব তাঁর (টিক্কা খানের।—অনুবাদক) উপর বর্তায়। তিনি বলেন, তিনি চার মাস আগে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসেন। তিনি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট পড়েছেন। তাই দাবি করেন, তা প্রকাশ করা হোক, তাতে জানা যাবে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের দায়দায়িত্ব কার। তিনি বলেন, তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব সামলে চলেছিলেন তখন ওখানে শেখ মুজিবুর রহমানের সমান্তরাল সরকার কায়েম ছিল, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ ছিল এবং বিহারীদের গণহত্যা চলছিল। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং তারপর সেখানে পাকিস্তানের পতাকা আবার দেখা যায়।

(দৈনিক 'নওয়ায়ে ওয়াক্ত্': ৭ জুলাই ১৯৭৯)

জেনারেল টিক্কা খান

সাবেক চিফ অব দ্য আর্মি স্টাফ জেনারেল টিক্কা খান ২ জানুয়ারি ১৯৯১ বলেন যে, ১৯৭২ সালে সেনাবাহিনী অপারেশনাল পরিকল্পনাসমূহের স্পর্শকাতর বৈশিষ্ট্যের কারণে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু পরে যখন সেগুলোকে একত্র করে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ডাইরেক্টরেটগুলোতে পাঠানো হলো তখন তা ক্যাবিনেট ডিভিশনে এই অনুমোদন দিয়ে ফেরত পাঠানো হয় যে, রিপোর্ট প্রকাশ করা যায়।

ইসলামাবাদের ইংরেজি দৈনিকের রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা কখনো মিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টোকে (যিনি সে সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন) বলিনি, সেনাবাহিনী এই রিপোর্ট প্রকাশ করা পছন্দ করবে না। সংবাদপত্রে এখন এ বিষয়ে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা বিভিন্ন প্রাথমিক তদন্ত ও সুপারিশ। এর সত্যতা সম্পর্কে আমাকে পরীক্ষা-যাচাই করতে হবে। সংবাদপত্রে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে অনুমিত হয়, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল রহিম খানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর সুপারিশ করা হয়েছিল। মে.-জে. রহিম খান গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর বাহিনী থেকে ফেরার হয়ে যান। আমি এই ঘটনার আর একবার অনুসন্ধান করেছিলাম। তাতে জানা যায়, তিনি এভিয়েশন হেলিকপ্টারের সাহায্যে বার্মা যাওয়ার অনুমতি নিয়েছিলেন। এ অনুমতি তৃতীয় কোরের কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি দিয়েছিলেন। এজন্য আমরা তাকে (মে. জেনারেল রহিম খানকে।—অনুবাদক) একটি ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের কমান্ড দিই এবং পরে তাকে পাকিস্তান আর্মির জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফ করা হয়। কেননা তিনি তার ফৌজ ছেড়ে ফেরার হননি।

আমরা লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির বিরুদ্ধেও, যিনি ভারতীয় কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, কোনো অভিযোগ পাইনি। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ও কমান্ডার জেনারেল-ইন-চিফ ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে আত্মসমর্পণের অনুমতি নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নিইনি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে সাধারণ সুবিধাদিসহ অবসর প্রদান করি।

জেনারেল টিক্কা খান ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তার জবানবন্দি রেকর্ড করান। পরদিন তাকে চিফ অব দ্য আর্মি স্টাফ করা হয়।

তিনি বলেন, পুরো জাতি পরাজয়ের বেদনায় অস্থির ছিল। তা সত্ত্বেও সামরিক কমিশন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালিয়ে যায় এবং কোনো শক্তিমানের বা বৃহতের কোনো তোয়াক্কা করে না। লে. জেনারেল এস. জি. এম. পিরজাদা, মেজর-জেনারেল উসমান মিঠা, জেনারেল হামিদ খানসহ সমস্ত বিতর্কিত জেনারেল কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হন। তাঁরা বলেন, তাঁরা সুপ্রিম কমান্ডারের আদেশ মোতাবেক কাজ করেছেন। তাই

তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তবে তাঁদের সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেওয়া হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, যিনি জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁকেও সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নিয়ে ডাইরেক্টর জেনারেল, মিলিটারি ট্রেনিং করা হয়। তারপর তাঁকে সামরিক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। জেনারেল টিক্কা খান, যিনি বেনজির ভুট্টোর সরকারের সময়ে পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন, তিনি এও বলেন, "আমি এই রিপোর্ট প্রকাশের দাবি করবো না, কিন্তু রাজনীতিবিদদের এ দাবি করা উচিত, যাতে জাতি জানতে পারে আসলে হয়েছিল কী? চিফ অব আর্মি স্টাফের ক্ষমতাবলে আমি রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে জেনারেল জিয়াউল হক সেনাবাহিনীকে খুশি রাখার নীতি অনুযায়ী রিপোর্ট হিমাগারে নিক্ষেপ করেন।"

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ফরমান আলীর বক্তব্য (১)

ভারতে সামরিক বন্দী হিসেবে ২ বছর ৪ মাস কাটানোর পর আমি বন্দীদের শেষ দলের সঙ্গে ২১ এপ্রিল ১৯৭৪ পাকিস্তান ফিরে আসি। আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা হলো, কিন্তু চাপা ব্যবহার ও রহস্যময় পরিবেশ ছিল। প্রশ্নকারী সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা ছিলেন না, যা ছিল অস্বাভাবিক। ১৯৭১-এর ঘটনাবলীর পরপর দেশে মৌলিক সব পরিবর্তন ঘটেছিল। মিস্টার ভুট্টো 'নয়া পাকিস্তানের' রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। দূরে দূরে রেখে আমাদের নিরাপত্তা বিধান ছিল উদ্দেশ্য। আমরা কেবল সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত অফিসারদের নিজেদের কাহিনী শোনাতে পারতাম। তারাই আমাদের জেরা করার যা করতেন। বাস্তব অবস্থা ছিল, আমার আসার আগে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত সৈনিক ফিরে এসেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে যথাবিধি জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গিয়েছিল। তাই জিজ্ঞাসাবাদকারীরা যে চিত্র এঁকে রেখেছিলেন তা আমার মাথায় ক্রমে ক্রমে যা জমে উঠেছিল তা থেকে ছিল অন্যরকম। আমাকে একটা প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় যা পূরণ করে আমি ফেরত দিই। প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা রিপোর্ট তৈরি করে জিএইচকিউতে পাঠানো হয়। সেখানে লে. জেনারেল আফতাব আহমদ খানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত ছিল। মেজর জেনারেল বা সমরূপ পদের নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর তিন জ্যেষ্ঠ অফিসার ওই কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির সামনে আমি উপস্থাপিত হই। অন্য জ্যেষ্ঠ অফিসাররাও এভাবে উপস্থাপিত হন। আমি এখানে বলতে চাই, ব্যক্তিকে তার নিজের পক্ষ সমর্থন করতে হয়। কিন্তু কমিটি বা কমিশন নিযুক্ত হলে তার সামনে অন্যরাও তাদের বক্তব্য বলেন। এভাবে দুই বিবরণ বা অভিমত নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সঠিক তদন্তের প্রক্রিয়া করা হয়। এভাবে যে রায় পাওয়া যায় তা পক্ষপাতহীন হয়। সেই আলোকে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে অবসর প্রদান, তার সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ বা তাকে বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়। আমাকে অভিযোগ থেকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হয়। তার পরপরই আমাকে হামুদুর রহমান কমিশনের মুখোমুখি হতে হয় যা পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক পরাজয়ের অবস্থা ও কার্যকারণ পরীক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল। এ ছিল একটি আদালতি প্রতিষ্ঠান যার প্রধান ছিলেন পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস মিঃ জাস্টিস হামুদুর রহমান। অন্য সদস্যরা ছিলেন সিন্ধু হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস মিঃ জাস্টিস তোফাইল আলী এ. রহমান,লাহোর হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস মিঃ জাস্টিস আনওয়ারুল হক, মিলিটারি এডভাইজার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলতাফ কাদির, আইন উপদেষ্টা মিস্টার হাসান।

সামরিক বন্দিত্ব থেকে ছাড়া পাওয়ার অনেক আগে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশন তার প্রাথমিক সুপারিশ সম্পূর্ণ করেছিল। তাতে এই মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মে. জেনারেল ফরমান আলী, লে. জেনারেল নিয়াজি, আরো কিছু অফিসার যাঁরা এখন সামরিক বন্দী রয়েছেন, যখন ফিরে আসবেন, তাঁদের উপযুক্ত তদন্ত করা হবে, যাতে জানা যায় জেনারেল ফরমান আলী কী অবস্থায় মিঃ পল মার্কের মাধ্যমে জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁর ক্ষমতা তাঁকে কে দিয়েছিল? পরে এই কথাগুলো তুলে দিয়ে কমিশন যেভাবে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল তার পর্যালোচনা করা হয়। সেই রায় কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেখানে ঘটনা হচ্ছে আমি আমার ফিরে আসার পর কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিলাম। আমার প্রত্যাবর্তনের পর কমিশনকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছিল। কমিশন আমাদের বক্তব্যাদি শোনার পর নিশ্চিত রিপোর্ট তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করেন। নিশ্চিত রিপোর্ট গোপন রাখা হয়েছে।

নিশ্চিত রিপোর্টের কথা কেউ বলে না, কেননা কমিশন তার নির্ধারিত চার্টার অনুযায়ী বিচার করেছিলেন। কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল এজন্য যে, তারা 'সেই সব বিষয়ের পর্যালোচনা করবেন যা সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সঙ্গে জড়িত।' কমিশন এই ট্রাজেডিতে রাজনীতিবিদদের কিছু আচরণ সম্পর্কেও মত প্রকাশ করেন।

ব্যক্তিগতভাবে কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার আগে আমাদের প্রত্যেকে লিখিত বক্তব্য দিয়েছিল যার ভিত্তিতে সদস্যরা আমাদের যেসব প্রশ্ন করবেন তা তৈরি করে রেখেছিলেন। অভিযুক্তরূপে উপস্থিত হওয়ার এই আমার প্রথম ঘটনা। কমিশনের সামনে আমি তিন দিনে প্রায় ১৩ ঘণ্টা উপস্থিত ছিলাম। প্রথম দিন আমার লিখিত বক্তব্যে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী এবং তাদের পাকিস্তান সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে আমি যে মত দিয়েছিলাম তাই নিয়ে ঝামেলা হয়ে যায়। হামুদুর রহমান ছিলেন বাঙালি। আমার অভিমত তাঁর পছন্দ হয়নি, এবং কথার সূচনায় তাঁরা উষ্মা প্রকাশ করলেন। আমি অনুভব করলাম, এই কমিশন হচ্ছে এক বিরূপ আদালত, কিন্তু আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিলাম না, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তর্কও করলাম না। যেমন যেমন জেরার ধারা এগিয়ে চলল, পরিবেশ আমার অনুকূলে বদলাতে লাগলো। দ্বিতীয় দিন আমাকে সম্মানিত জজ সাহেবদের সঙ্গে চা খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হলো। আর কথা বলতে বলতে বুঝতে পারলাম, রাজনীতিবিদরা বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কাজে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কথা তাঁরা ভালো রকম জানেন। তৃতীয় দিনটি ছিল আমার পক্ষে অশেষ স্বস্তিকর। ওই দিন প্রায় তিন ঘন্টা জেরার পর আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। বিচারপতি হামুদুর রহমান বললেন, 'জেনারেল ফরমান, আমরা সামনাসামনি জেরা করা অফিসারদের মধ্যে আপনাকে সবচেয়ে মেধাবী আর সৎপথগামী পেয়েছি। আমরা আজ আপনাকে সেই মিলিটারি প্ল্যানটি দেবো যেটি আমরা সুপারিশ করছি, আর যা পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষার জন্য অনুসরণ করা উচিত ছিল। আমরা আপনার মত জানতে চাইবো।'

লে. জেনারেল আলতাফ কাদির প্ল্যান দিলেন। আসামি বিচারক হয়ে গেলো। আমি আমার অভিমত দিলাম যা গ্রহণ করা হলো।

আমার চরিত্র সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

মেজর জেনারেল ফরমান আলীর চরিত্র সম্পর্কে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি

১৩। এই বিষয়টি শেষ করার আগে মেজর জেনারেল ফরমান আলী সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেননা বিদেশী সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ করেছেন।

১৪। এই অফিসার পূর্ব পাকিস্তানে পাঁচ বছর ছিলেন (বিভিন্ন দায়িত্বে)।

১৫। ২৫ মার্চ ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক আইন আরোপের পর তিনি যেসব দায়িত্বে কাজ করেছেন তার জন্য তাঁর অসামরিক কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সংযোগ রাখা আবশ্যকীয় ছিল। সেই সঙ্গে তাঁকে সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গ্রুপ ও স্তরের মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটরদের সঙ্গেও সংযোগ রাখতে হতো। তিনি সহজভাবে কমিশনের সামনে স্বীকার করেন যে, ২৫ মার্চ ১৯৬৯ তারিখে আরোপ্য সামরিক তৎপরতার পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল।

পরে সামরিক সরকার পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যেসব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ন্যাশনাল ও প্রাদেশিক এসেম্বলির আওয়ামী লীগের বৃহৎ সংখ্যক সদস্যকে অযোগ্য ঘোষণা করার ফলে সৃষ্ট শূন্য আসনগুলোতে প্রস্তাবিত উপনির্বাচনও ছিল, তার সঙ্গেও তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। জেনারেল তাঁর যে লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন, পরে তাঁকে যে দীর্ঘ জেরা করা হয়, সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সাক্ষী যে বিবরণাদি দেন তার আলোকে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, মেজর জেনারেল ফরমান আলী একজন প্রতিভাবান ও আন্তরিক স্টাফ অফিসাররূপে বিভিন্ন দায়িত্বে উত্তম উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন। তিনি কোনো অবস্থাতেই জেনারেল ইয়াহিয়ার চারদিকে ঘুরে বেড়ানো ও তার প্রসাদভোগী সামরিক জান্তার সদস্য ছিলেন না। আমরা এও জানতে পেরেছি, তিনি কোনো স্তরেই এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেননি এবং এমন কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি যা জনগণের বিরুদ্ধে ছিল এবং প্রশাসনিক জবরদস্তি ছিল বা মানবিক সহমর্মিতার বিরুদ্ধে ছিল। এই ব্যাপারে আমরা এই রিপোর্টের আগের অধ্যায়ে বহু দূর পর্যন্ত আমাদের অভিমত ব্যক্ত করেছি। শেখ মুজিবুর রহমান জেনারেল ফরমান আলী সম্পর্কে যে বলেছেন, 'সে পূর্ব পাকিস্তানকে সবুজ থেকে লাল বানাতে চেয়েছিল', এই সমস্ত গল্পটাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। (এখানে উর্দুতে ঠিক কথাগুলো আছে, 'ওহ্, মশ্‌রিকী পাকিস্তান কো সব্‌জ্ সে সুর্‌খ। বনানা চাহ্‌তে থে'।— অনুবাদক)

১৬। যুদ্ধের সঙ্গিন সময়গুলোতে এই অফিসারের সামরিক কার্যাবলীর সঙ্গে কার্যত কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের সঙ্গে তাঁর নিকট যোগাযোগ ছিল। এটাই ছিল কারণ যার

জন্য তাঁকে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয় যাকে 'ফরমান আলী ঘটনা' বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পরাজয় সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ যে অধ্যায়ে দেওয়া হয় তাতে বলা হয়েছে, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ জেনারেল ফরমান আলী জাতিসংঘের জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার অনুমোদন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর দিয়েছিলেন। গভর্নর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছ থেকে পূর্বাহ্ণে তার অনুমতি ও অধিকার গ্রহণ করেছিলেন। ওতে পূর্ব পাকিস্তান সংক্রান্ত নিষ্পত্তি (উর্দুতে আছে 'তস্‌ফিয়া'।—অনুবাদক) ও ওখানে সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করার প্রস্তাব ছিল। সেই পরিস্থিতিতে ওই বার্তা প্রেরণের অধিকার ও তা পাঠানোর দায়িত্ব ওই অফিসারের নয়। বস্তুত, তিনি তখন তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করার মানসে কোর্ট মার্শাল বিচারের দাবি করেছিলেন। এখন সত্য যা স্পষ্ট হয়েছে, এমন কোনো তদন্ত বা বিচারের কোনো দরকার নেই।

১৭। অবস্থা ও পরিস্থিতির শেষ পর্যায়ে যখন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা অস্ত্রসমর্পণের কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য আলোচনা করতে লে. জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে মিলিত হতে আসেন তখন মেজর জেনারেল ফরমান আলী ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার্সে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের কাছে ওই দুই অফিসারের কাজের ঢং ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ এসেছে তাতে এই সিদ্ধান্ত রেকর্ড করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট সময়ে জেনারেল ফরমান আলী লে. জেনারেল নিয়াজিকে যথাযথ লাইনে পরামর্শ দিয়েছেন। যদি তাঁর মত অনুযায়ী কাজ করা হতো তাহলে কোনো কোনো লজ্জাজনক ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো।

১৮। আমরা এর কারণগুলোও খতিয়ে দেখেছি, কেন কমান্ডার-ইন চিফ মানেকশ কোনো পুস্তিকায় জেনারেল ফরমান আলীকে পাকিস্তান আর্মির কমান্ডার নামে সম্বোধন করেছেন। দেখে মনে হয়, ৮ ও ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজিকে তাঁর নিজের মোর্চার বাইরে আর দেখাই যায়নি। বিবিসি'র এক সম্প্রচারে বলা হয়, তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছেন আর জেনারেল ফরমান আলী পাকিস্তান আর্মির কমান্ড নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই ছিল কারণ যার জন্য ভারতীয় কমান্ডার জেনারেল ফরমান আলীকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, জেনারেল ফরমান আলী কোনো সময়েই ভারতীয় জেনারেলদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেননি।

১৯। একটি দোষারোপ কমিশনের সামনে লে.জেনারেল নিয়াজি করতে চেয়েছিলেন: জেনারেল ফরমান আলী পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার ভাইপোর হাতে, যিনি সেনা বাহিনীতে হেলিকপ্টার পাইলট ছিলেন, প্রায় ষাট হাজার টাকা পাঠান। তিনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খুব সকালে ঢাকা থেকে রওনা হন। আমরা জেনারেল ফরমান আলীর কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইলে তিনি জানান:

ইসলামিয়া প্রেসকে দিয়েছেন ৪০০০ টাকা

রহিমকে রাস্তার খরচের জন্য দিয়েছেন ৫০০০ টাকা।
বাড়ি-ভাড়া, যার অনুমোদন গভর্নর দিয়েছেন, কেটে নেন ৫০০০ টাকা
ফিরে এসে ট্রেজারিতে জমা দেন ৪৬০০০ টাকা।

২০। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা সহজে বোঝা যায়, তা মেনে নেওয়া হলো।

২১। জেনারেল ফরমান আলী যে তথ্যাদি দিয়েছেন তার সত্যতা সহজে যাচাই করা যায়।

২২। বিবৃত বক্তব্যের কার্যকারণসমূহের ভিত্তিতে জেনারেল ফরমান আলী পূর্ব পাকিস্তানে চাকরির যে পুরো মেয়াদ কাটান তার উপর কোনো নঞর্থক রায় দেওয়া যায় না।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ফরমান আলীর বক্তব্য (২)

কমিশনকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমার সম্পর্কে যেসব অভিযোগ ছিল তাঁর পুরো তদন্ত করা। মিস্টার ভুট্টোর সরকারি ঢাকা সফরের সময় মিস্টার মুজিব তাঁকে একটা ডায়েরি দেখান। তাতে আমি লাল কালিতে লিখেছিলাম, 'সবুজ পূর্ব পাকিস্তানকে লাল বানিয়ে দেওয়া হবে।' (বইয়ে উর্দুতে আছে: 'সব্‌জ্‌ মশরিকি পাকিস্তান কো সুর্‌খ্‌ বনা দিয়া যায়েগা।'—অনুবাদক) মুজিব এ জিনিস সারা দুনিযাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। আর একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন যে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জাতিবিলোপের পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। আর ওই বাক্যটি প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হচ্ছিল: লাল বানিয়ে দেওয়ার অর্থ ছিল, আমরা রক্তে স্নান করিয়ে দেবো।

এই অভিযোগের কথা যখন উঠলো আমি স্বীকার করলাম, লেখা আমার, কিন্তু কথা আমার নয়। এর পেছনে যে কথাটি ছিল তা এরকম:

নির্বাচনী তৎপরতাঁর কালে ন্যাপ (ভাসানী গ্রুপ)-এর এক সভা হচ্ছিল ১৯৭০-এর জুনে পল্টন ময়দানে। বক্তৃতায় যা হয়ে থাকে, বক্তা যখন তাঁর সামনে লাখ লাখ মানুষের জমায়েত দেখেন তাঁর আর হুঁশ থাকে না। তাঁরা তখন এমন সব কথা বলেন, যা সাধারণত তাঁরা মুখ দিয়ে বের করেন না। ইনটেলিজেন্স স্টাফ কোর কমান্ডারকে কয়েকটি বক্তৃতাঁর রিপোর্ট দিয়েছিলেন। যেহেতু আমি অসামরিক অফিসারদের দায়িত্বে ছিলাম, সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াকুব আমাকে টেলিফোন করে বললেন, 'ফরমান, তোয়াহাকে বলো উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা যেন না করেন। না হলে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।'

আমি জানতে চাইলাম, তোয়াহা কী বলেছেন?

জেনারেল যা বললেন, আমি টেবিল ডায়েরিতে লিখে নিলাম, ডায়েরিটা আমার সামনে পড়ে ছিল। কথাগুলো এই ছিল: 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজকে লাল করে দেওয়া হবে।' (বাক্যটি জেনারেল ফরমান আলী প্রত্যেকবার একরকম বলেননি, শব্দের এদিক-ওদিক হয়েছে। উর্দুতে যেমন পাওয়া গেছে তাঁর যথাযথ অনুবাদ করা হয়েছে বলে বাংলা পাঠও সবখানে একরকম নেই, যদিও উর্দুর মতো বাংলায়ও অর্থের বিশেষ তাঁরতম্য ঘটেনি। শেষোক্ত উর্দু পাঠে বাক্যটি আছে: 'মশ্‌রিকি পাকিস্তানকে সব্‌জ্‌ কো সুর্‌খ্‌ কর্‌ দিয়া যাগেয়া'।—অনুবাদক)

আমি তোয়াহাকে বললাম, আমার সঙ্গে এসে দেখা করুন। উনি ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট। সায়েন্টিফিক কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, সিনিয়র রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করা ছিল। তাই আত্মগোপন করে

থাকতেন। আট ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁরপর তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারলাম। আর তাঁকে নিশ্চয়তা দিলাম, তিনি যখন গভর্নর হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন কোনো লোক তাঁকে গ্রেফতাঁর করবে না। তিনি এলেন, লিখে রাখা কথাটা তাঁকে পড়ে শোনালাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই কথা তিনি কেন বলেছেন? উনি বললেন, এ কথা তাঁর বক্তৃতায় ছিল না, এ কথা কাজী জাফর বলেছেন (যিনি পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন)। উনি বললেন, এর অর্থ, তিনি সবুজ (অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্র) পাকিস্তানকে লাল (কমিউনিস্ট) রাষ্ট্র বানাবেন। সারা দুনিয়ায় কমিউনিজমকে লাল রং দিয়ে বোঝানো হয়। আমি তাঁর ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে জেনারেল ইয়াকুবকে জানালাম। এভাবে সেই মামলা শেষ হয়ে গেলো। কমিশন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে এর সত্যতা যাচাই করেছে। ওখান থেকে আসল ডায়েরি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কমিশন ১৮৩ পৃষ্ঠার ২৩১ প্যারায় লিখেছেন: 'এই দলিল পরীক্ষা করে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ রাইটিং প্যাড বা টেবিল ডায়েরি ছিল যাতে জেনারেল তাঁর কাজের সময় বিভিন্ন নোটিস লিখতেন। জেনারেল যে ব্যাখ্যা দেন তা যথার্থ মনে হচ্ছে।'

একটা অভিযোগ ছিল, আমি ১৬ ডিসেম্বর রাতে দুশো বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করি। ১৬ ডিসেম্বর রাতের আগে অস্ত্রসমর্পণ করা হয়ে গিয়েছিল, ভারতীয়রা ঢাকার প্রশাসন ও দায়িত্ব তাঁদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। ঘটনা হচ্ছে, ১৭ ডিসেম্বরের সকালবেলা বহু সংখ্যায় লাশ পড়ে আছে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের পাকিস্তানি ফৌজ ছাড়া আর কেউ হত্যা করে থাকবে, কেননা ফৌজ তো ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিল। এর প্রেক্ষাপট, আমি যতোখানি জানি, এই যে, ১০ ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় আমাকে ঢাকার কমান্ডার মেজর জেনারেল জমশেদ ধানমন্ডির পিলখানায় তাঁর দপ্তরে আসতে বললেন। তাঁর কমান্ড পোস্টের কাছে পৌঁছে আমি দেখি সেখানে অনেক গাড়ি। তিনি তাঁর মোর্চা থেকে বেরোচ্ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর কারে যেতে বললেন। কয়েক মিনিট পরে জানতে চাইলাম, এতো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কেন? বললেন, 'এই ব্যাপারে কথা বলতেই আমরা নিয়াজির কাছে যাচ্ছি।' তখনো কোর হেড কোয়ার্টার্সের রাস্তায়ই আমরা আছি, উনি আমাকে বললেন, তিনি বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার আদেশ পেয়েছেন। বললাম, 'কেন, কিসের জন্য? এখন ওই কাজ করার সময় নয়।'

আমরা যখন নিয়াজির দপ্তরে গিয়ে পৌঁছলাম, জমশেদ ওই কথা ওঠালেন। নিয়াজি আমার মত জানতে চাইলে বললাম, 'এখন সময় নয়। আপনি আগে যাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন আপনাকে তাঁদের হিসাব দিতে হবে। দয়া করে এর বেশি গ্রেপ্তার করবেন না।'

উনি মেনে নিলেন। আমার সন্দেহ, প্রথম আদেশ বাতিল করার আদেশ জারি করা হয়নি, তাই কিছু লোক গ্রেপ্তার করা হয়। আমি আজ পর্যন্ত জানি না তাঁদের কোথায় রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তাঁদের এমন এলাকায় রাখা হয়েছিল যার হেফাজত মুজাহিদরা করছিল। ('মুজাহিদ' শব্দের অর্থ ধর্মযোদ্ধা, যাঁরা জেহাদ করছেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যে পাকিস্তানপন্থী বেসামরিক স্থানীয়দের 'রাজাকার' বলা হয়, এখানে তাঁদেরকে মুজাহিদ বলা হয়েছে। 'রাজাকার' মানে

স্বেচ্ছাসেবী–অনুবাদক)। কোর বা ঢাকা গ্যারিসন কমান্ডারের আত্মসমর্পণের পর তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তাঁরা মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পালিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী মুজাহিদদের নির্বিচারে হত্যা করছিল। এমন হতে পারে, গ্রেপ্তারকৃত লোকগুলোকে মুক্তিবাহিনীর লোকে হত্যা করে ফেলেছিল। কিংবা ভারতীয় ফৌজ হত্যা করেছিল, যাতে পাকিস্তানি ফৌজের বদনাম করা যায়। ভারতীয় ফৌজ তো আগেই ঢাকার ওপর কবজা করে নিয়েছিল।

আমি তখনো ঢাকাতেই ছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল নাগরা আমাকে তাঁর অভিযোগের সম্মুখীন করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি ওর সঙ্গে কি করে জড়িত থাকতে পারি? আমি একলা এতোগুলো মানুষকে কী করে হত্যা করতে পারি? আমার হাতে কোনো কমান্ডও ছিল না, কোনো বিভাগের দায়িত্বও ছিল না। তিনি আমার কথা মেনে নিলেন। কিন্তু যখন আমরা জব্বলপুর পৌঁছলাম, এই প্রশ্ন আবার দেখা দিলো। ভারতীয় বাহিনীর ডিডিএমআই ব্রিগেডিয়ার লাজলি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার কাছে এলেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন: আপনার বিরুদ্ধে ১৬-১৭ ডিসেম্বরের মধ্যরাতে দুশো বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? বললাম, জেনারেল নিয়াজি সিঁড়ির ওপর বসে রয়েছেন, গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করুন ১০ ডিসেম্বর আমি ওইসব ব্যক্তির গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করেছিলাম কিনা। যদি আমি তাঁদের গ্রেপ্তারিরই বিরোধিতা করে থাকি তাহলে তাঁদের হত্যা করার আদেশ কেন দেবো? তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিয়াজির কাছে গেলেন। মিনিট দশেক পরে ফিরে এলেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তিনি এখন আর কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমি রাজলিকে যেকথা বলেছিলাম নিয়াজি তাঁর সত্যতা স্বীকার করেন। ভারতীয়দের নিজেদের খুব বাসনা ছিল পাকিস্তানি ফৌজের কোনো দায়িত্বশীল অফিসারকে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁরা জড়িত করে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ব্রিগেডিয়ার বশীর ও অন্য ৫০ জন অফিসারকে দিল্লিতে নিঃসঙ্গ কারাবাসে রাখা হয়েছিল, তাঁদেরকে পুরাদস্তুর জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন অফিসার আমাকে বলেছিলেন, ভারতীয়রা বলছিল, যে কেউ জেনারেল ফরমানকে জড়িত করে বলবে, তিনি সেই গণহত্যার আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে জলদি পাকিস্তান যেতে দেওয়া হবে। কোনো অফিসার তা করেননি। তাঁর জন্য আমি তাঁদের প্রতি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। কেউ তাঁদের প্রলোভন কবুল করেনি। আর এখানে পশ্চিম পাকিস্তানে দোষারোপ করা হচ্ছে পাকিস্তানি ফৌজ পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। সেই অভিযোগের ব্যাপকভাবে প্রচারও করা হচ্ছে। তাঁর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, আর সেনাবাহিনীর দুর্নাম করা।

জিএইচকিউ (আফতাব কমিটির) স্পেশাল কমিটি আর হামুদুর রহমান কমিশন উভয়ে আমাকে অভিযোগগুলি থেকে মুক্ত করে দেয়। আর আমাকে জিএইচকিউ-এ মিলিটারি ট্রেনিং-এর ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্তের এ ছিল পরিষ্কার ইঙ্গিত। কিন্তু দেশের বাইরে থেকে তাঁর সত্যায়ন পাওয়া গেলো। ১৯৭৫-এর আগস্টে প্রেসিডেন্ট ফজল ইলাহী চৌহদ্রি ভিয়েনা সফরে যান, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর ডাঃ মালিকের সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকে আমার জন্য তাঁর একটি চিঠি

আনেন। (এ-চিঠি পরে দ্রষ্টব্য।–অনুবাদক) মিস্টার ভুট্টো কমিশনের বিচার্য বিষয় সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণসমূহের তদন্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। যাই হোক, ১৯৭১-এ যা কিছু হয়েছে তা রাজনৈতিক ভ্রান্তির পরিণাম ছিল, তা জেনেশুনে করা হোক অথবা ভুলবশত হোক। এই কারণেই কমিশন মিস্টার ভুট্টোকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। আর এও রেকর্ড করা হয় যে, পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান 'তোমরা ওপারে আমরা এপারে' তাঁর এই শ্লোগানের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আর ইয়াহিয়ার কথা যদি বলতে হয়, কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি সবকিছুর দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছেন।

ব্রিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) এ আর সিদ্দিকী (যিনি ইন্টারসার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্সের ডাইরেক্টর ছিলেন) 'অবজারভারে' নিজের কলামে মেজর জেনারেল সিভিল অ্যাফেয়ার্স (এমজিসিএ) রূপে আমার চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর মধ্যে বেশির ভাগ হামুদুর রহমান কমিশন লিখিতভাবে আমাকে যেসব প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। আমিও লিখিতভাবে সেগুলোর উত্তর দিয়েছিলাম। তাঁরপর আমি কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হই। আর কমিশনের অশেষ বিচক্ষণ, শ্রদ্ধেয় সদস্যরা ১৩ ঘণ্টা পরিপূর্ণরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।...

আমি জানি না ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী হামুদুর রহমান কমিশনের তুলনায় আরো ভালো বিচারক হবেন কি না, বিশেষ করে যখন তিনি একক এক ব্যক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। এই দুই জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। কমিশন কেবল শত শত নাগরিক, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ অফিসার, সম্মিলিত কমান্ডার আর বিদেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেননি, বরং তাঁরা বিভিন্ন বিবরণ ও বক্তব্যের সুচিন্তিত পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি এক জেনারেল একটি ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলেছেন তো তাঁরা সেই ঘটনা সম্পর্কে অন্য জেনারেলদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে সেটাকে যথার্থ বলে স্থির করেছেন বা বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর পর তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং এই সুপারিশ লিপিবদ্ধ করেছেন: 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে পুরো মেয়াদের চাকরিকালে মেজর জেনারেল ফরমান আলীর কাজকর্ম ও চালচলন সম্পর্কে কোনো বিরূপ সিদ্ধান্তের দরকার নেই।'

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী তাঁর নিবন্ধের সূচনা এফএম মেনস্টেনের একটা কথা দিয়ে করেছেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে সেই কথার কোনো সম্পর্ক নেই। হিটলারের আদেশে জার্মান বাহিনীর কয়েকজন জেনারেল যে গণহত্যা চালিয়েছিলেন, মেনস্টেন সে ব্যাপারে কথা বলছিলেন। যে কথা আমরা সবাই জানি। তাঁরা তাঁদের ফুয়েরারের জন্য যাবতীয় আদেশ পালন করেছিলেন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো কমান্ডার ছিলাম না। আমি এমজিসিএ, একজন স্টাফ অফিসার ছিলাম। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমার নিজের সিদ্ধান্ত রয়েছে। আমি বলতে চাই, তর্ক-বিতর্কের সময় একজন অফিসারকে সাহসের সঙ্গে এবং স্পষ্টভাবে তাঁর ধ্যান-ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু একবার যদি কোনো আদেশ দিয়ে দেওয়া হয় তখন প্রত্যেক অফিসার আর প্রত্যেক সিপাহির অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে তা পালন করতে হবে। কেন, এ প্রশ্ন চলবে না। না হলে বাহিনীতে

বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং ন্যায়যুদ্ধের একটি ফৌজ অচল হয়ে যাবে। আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে, ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী ব্যক্তিগতভাবেও সে সময় তাঁর কমান্ডার-ইন-চিফের আদেশগুলো পালন করে থাকবেন যখন তিনি আইএসপিআর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী ভারতের যে সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করেছেন ও সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেটা একটা গল্পের বর্ণনা। দুশমন হচ্ছে দুশমন। সে আপনার ফৌজ আর জেনারেলদের খাটো করার জন্য সবকিছু করবে। পাকিস্তানের ফৌজ হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্যস্থল। কারণ এ তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এবং তাঁকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার সুযোগ লাভে বাধা দেয়। কেচ্ছা-কাহিনীর সত্যতা যাচাইয়ের প্রশ্ন যদি ওঠে, সে ক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী কি, ধরুন, সালমান রুশদির মিথ্যা বিবরণের সমর্থন করবেন? তিনি নিজেদের তুলনায় ভারতীয় লেখকদের উপর বেশি বিশ্বাস কেন ন্যস্ত করছেন? আমি তাঁকে বলবো, আমার চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য তিনি যেন মেহেরবানি করে সিদ্দিক সালিকের লেখা 'উইটনেস টু সারেন্ডার' পড়েন।

হতে পারে, আমি কতকগুলো ভুল করেছি। কিন্তু ব্রি. সিদ্দিকী এমনভাবে দোষারোপ করেছেন, যেন যা কিছু ঘটেছে তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার। কেন, নিজের কর্মক্ষেত্রের পুরোপুরি কমান্ড আর কন্ট্রোল কারো হাতে থাকা অপরাধ নাকি? আমি আমার দেশের সেবা করা ও তাঁকে ভেঙে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য দৈনিক ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেছি। ব্রিগেডিয়ার কয়েকবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কেন, তিনি কি আমাকে কখনো দাম্ভিক, সৌজন্যহীন পেয়েছেন? বা আমার মধ্যে বিনয় ও পরিশীলনের অভাব দেখেছেন? আমার বিশ্বস্ত সেবার জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত টেনেছেন: 'মেজর জেনারেল ফরমান আলী এক প্রতিভাবান, কর্মচঞ্চল ও খাঁটি স্টাফ অফিসাররূপে কাজ করেছেন।'

ব্রি. সিদ্দিকীর প্রশ্নাবলী ১৯৬৯ থেকে শুরু হয়েছে। যদি তাঁকে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাঁর কারণসমূহের অনুসন্ধান করতে হয় তাহলে লাহোর প্রস্তাব থেকে তাঁকে তা করতে হবে। বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে, বারবার বলতে হবে, ইয়াহিয়া যখন ক্ষমতা পেলেন তখন বাঙালির জাতীয়তাঁর চেতনা ফুলে-ফলে পূর্ণ বিকশিত হয়ে গেছে। তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য হওয়ার পরিণামে তাঁদের হতাশার বোধ বেড়ে গিয়ে তা প্রাদেশিক স্বশাসন ও শেষ পর্যন্ত ৬ দফার রূপ লাভ করে। বাঙালিরা পুরাদস্তুর আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, ঘটনাস্থলে আমার পৌঁছানোর আগেই বিচ্ছিন্নতাঁর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নিছক এক স্টাফ অফিসাররূপে আমার হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। আমি কোর কমান্ডার ছিলাম না। সুতরাং বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাপারে আমার সিধা উত্তর হবে, আমাকে যে কাজ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে আমি তাই করেছি। তবে কিছু বিষয় প্রসঙ্গে আমার নিজের মতামত ছিল যার প্রকাশ আমি তর্ক-বিতর্কের সময় করেছি। পাকিস্তান যাদের জন্য ভেঙেছে, সেই ঘটনাবলী সৃষ্টি করার ব্যাপারে, সমস্ত কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও দেশের রাজনীতিবিদদের উপর বর্তায়। তবু আমি বিস্তৃতভাবে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছি যা তাঁর অধিকাংশ প্রশ্নের মধ্যে পড়ে।

(ক) আমি সামরিক কমান্ডার ছিলাম না। যুক্ত পাকিস্তানের শেষ দুই বছর আমি কেন্দ্রে ছিলাম না, প্রাদেশিক স্তরে কাজ করছিলাম। আমি আমার ধ্যান-ধারণা প্রকাশের ব্যাপারে কখনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখাইনি। কিন্তু প্রধান সামরিক আইন প্রশাসনের হেড কোয়ার্টারে আমি নীতিনির্ধারক ছিলাম না। আমি গভর্নর হাউসে স্টাফ অফিসার ছিলাম এবং জ্যেষ্ঠদের আদেশ পালন করতাম।

(খ) আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল, যা ছিল অবশ্যই আইনগত প্রকৃতির।

(গ) আমাদের মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিল। কেননা তিনি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন।

(ঘ) আমি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন মুলতবি করার বিরুদ্ধে ছিলাম, যা ৩ মার্চ ১৯৭১ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনের মুলতবির কারণে স্পষ্টতই আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ অন্যতম ফলস্বরূপ দেখা দেয়। কিন্তু সামরিক কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া হয়, যা আবার ভারতীয় অনুপ্রবেশ ডেকে আনে, যার ফলে সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটে।

দ্রষ্টব্য : সাহেবজাদা ইয়াকুব খান আর অ্যাডমিরাল আহসান আমার ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পুরো অবগত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সাহেবজাদা ইয়াকুব জীবিত আছেন। অতএব তাঁর কাছে আমার উক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা যাচাই করা যায়।

(ঙ) আমাদের ১৯৬৯ সালে বা ১৯৭০-এর শুরুতে নির্বাচন করতে হতো। এক বছরব্যাপী নির্বাচন তৎপরতা দেশের ঐক্যের পক্ষে অশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল।

(চ) আমি ৬-দফার বিরুদ্ধে ছিলাম, যাকে বিখ্যাত করে তোলা হয়েছিল (সাক্ষী: জেনারেল রহিম)। আপনি ন্যায়সঙ্গতভাবে জানতে চাইতে পারেন, আমি যদি সামরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলাম তাহলে আমি পদত্যাগ করলাম না কেন? আমি তাই করেছি যা ইয়াকুব সাহেব করেছেন (সাক্ষী: জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা), কিন্তু জেনারেল ইয়াকুবের পরামর্শে পদত্যাগ ফেরত নিয়ে নিই।

হামুদুর রহমান কমিশন আমাকে সম্পূর্ণভাবে ও শর্তহীন ভাষায় নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে। 'দি নেশন' ও 'নওয়ায়ে ওয়াকত' আমার চরিত্র সম্পর্কে উদ্ধৃতিসমূহ প্রকাশ করেছে। আরো সত্যতা প্রমাণের জন্য আমি একটা চিঠির কিছু কথা পেশ করছি যা আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফজল ইলাহী চৌহদ্‌রির মাধ্যমে ডাঃ আবদুল মালেকের কাছ থেকে ভিয়েনা থেকে পেয়েছি। আপনি এর সত্যতাঁর প্রমাণ জেনারেল সগির হোসেনের কাছ থেকে পেতে পারেন, যিনি সে সময় প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারি (এমএস) ছিলেন। ডাঃ মালেক লেখেন,

'আমার এ কথা জেনে খুব বেশি আনন্দ হলো যে, হামুদুর রহমান কমিশন আপনাকে সেই সমস্ত দোষ থেকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে যার কথা অন্যরা বলেছেন। আর আপনাকে মিলিটারি ফাউন্ডেশনের ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহতায়ালাকে ধন্যবাদ। তিনি সব সময় পরিপূর্ণ বিচার করেন। সেদিন অর্থাৎ ১৪ আগস্ট তিনি আর এক বিচার করেছিলেন। ওইদিন দুনিয়ার বুকে পাকিস্তান জন্মলাভ করেছিল।'

তারপর জাতিসংঘে প্রেরিত বার্তার ('সিগন্যাল') ব্যাপার। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল, কেননা ধরে নেওয়া হয়েছিল, আমি কোনো অধিকার ছাড়াই বার্তা পাঠিয়েছিলাম। ইসলামাবাদে সরকার এই বলে এক বিবৃতি দেন যে, জেনারেল ফরমানের জাতিসংঘে বার্তা পাঠানোর কোনো অধিকার নেই। আমি এ বিষয়ে একমত, আমার কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট গভর্নরকে যথাবিধি অধিকার দিয়েছিলেন। গভর্নরের সেই বার্তার জবাবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির সমস্যার সুরাহার স্বার্থে একটি রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেওয়ার চেষ্টার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করা হয়েছিল, গভর্নর নিম্নলিখিত বার্তা ('সিগন্যাল') পান:

'টপ সিক্রেট, জি ১০০০। প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে গভর্নরের প্রতি, আবার ইস্টার্ন কমান্ডকে শোনানো হোক। আপনার ৯ ডিসেম্বর প্রেরিত দ্রুত বার্তা, এ. ৪৬৬০ পাওয়া গেলো এবং ভালোভাবে বোঝা গেলো। আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যে, আমার কাছে পেশকৃত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমি আন্তর্জাতিকভাবে যাবতীয় পদক্ষেপের ব্যাপারে আলোচনা করেছি এবং করছি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে পরস্পরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সম্পূর্ণরূপে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন সামনে রেখে, সবকিছু আপনার উত্তম বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি যা কিছু সিদ্ধান্ত করবেন আমি তা মেনে নেব। এবং আমি একই সঙ্গে জেনারেল নিয়াজিকেও নির্দেশ দিয়েছি, তিনি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সেই মতো ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করবেন। আপনার ইচ্ছার উপর ভরসা রয়েছে: আইন-অমান্য ধরনের অচিন্তিতপূর্ব ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য কী কী চেষ্টা করবেন। আপনি বিশেষভাবে আমাদের সশস্ত্র সৈন্যদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তাই আমাদের শত্রুদের সঙ্গে যাবতীয় রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন করে সশস্ত্র সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে।'

এই বার্তায় সশস্ত্র সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন করার জন্য গভর্নরকে স্পষ্টভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। (সশস্ত্র সৈন্যরা যখন নিজেদের প্রতিরক্ষা করে চলেন বা যখন অস্ত্রসমর্পণ করেন, উভয় অবস্থাতেই রক্ষাপ্রাপ্ত হন।) এও লক্ষ্য করুন,'পূর্ব পাকিস্তানে' না বলে 'পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

চিফ অফ আর্মি স্টাফ একই সঙ্গে জেনারেল নিয়াজিকেও নিম্নরূপ বার্তা পাঠান:

'সিওএএস আর্মির তরফ থেকে কমান্ডারের প্রতি। গভর্নরের প্রতি প্রেসিডেন্টের সিগন্যাল বার্তার কপি আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার পর প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত গভর্নরের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। যেহেতু কোনো সিগন্যাল পরিস্থিতির নাজুক অবস্থার ব্যাপারে ঠিকভাবে অনুমান করে তা পৌঁছানো সম্ভব নয়, তাই ঘটনা সম্পর্কে যথার্থ সিদ্ধান্ত করার উদ্দেশ্যে তা আপনার উপরই ছেড়ে দিতে পারি। তবু এ এখন শত্রুর কাছে নিছক সময়ের প্রশ্ন। তাঁরা তাঁদের শক্তি, অতিবৃহৎ সংখ্যা ও সাজসরঞ্জামের সরবরাহ এবং বিদ্রোহীদের অতি উৎসাহী সহায়তা নিয়ে পরিপূর্ণরূপে পূর্ব পাকিস্তানকে জয় করে নেবে।

'এদিকে স্থানীয় বাশিন্দাদের জবরদস্ত ক্ষতি করা হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর বিপুল প্রাণহানি হচ্ছে। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, আপনাকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধের মূল্যের হিসাব করতে হবে। আপনাকে গভর্নরকে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে হবে, তিনি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা মোতাবেক তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত দেবেন। যখন আপনার মনে হবে এটা আপনার করা দরকার, আপনাকে অধিক থেকে অধিকতর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ধ্বংস করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তা শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে। আমাকে অবহিত রাখবেন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের অনুগ্রহ ও করুণা করুন।'

এই সিগন্যাল বার্তা প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পাঠানো অন্যান্য সিগন্যালের তুলনায় বেশি স্পষ্ট। কারণ, বস্তুত 'গভর্নরকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে' এই কথা ব্যবহার করা হয়েছে। এই বার্তা পাওয়ার পর গভর্নর ও চিফ সেক্রেটারি মোজাফফর নিম্নলিখিত বার্তা প্রস্তুত করেন:

প্রাপক: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। সূত্র: আপনার প্রেরিত ডিসেম্বর ০৯২৩০০-এর জি-১০০০। যেহেতু চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকারী সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে, তাই আপনার মঞ্জুরির পর আমি নিম্নলিখিত নোট অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মিস্টার পল হেনরির হাওয়ালা করছি। নোটের সূচনা এইরূপ: পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বেধে যাওয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ছিল না। তবু এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা সশস্ত্র সৈন্যদের প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। পাকিস্তান সরকারের সর্বদা এই ইচ্ছা থেকেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সমস্যাসমূহের ব্যাপারে মীমাংসা করা যায়। সেজন্য সংলাপ চালানো হচ্ছে। সশস্ত্র সৈন্যরা শত্রুর বিপুল সংখ্যার বিরুদ্ধে অশেষ বীরত্বের সঙ্গে লড়েছে এবং তাঁরা এখনো সে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আরো রক্তপাত ও নির্দোষ প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার স্বার্থে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করছি: যেহেতু সংঘাত রাজনৈতিক কারণসমূহের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তাই তাঁর অবসানও রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে হওয়া দরকার। সেহেতু এতদ্ দ্বারা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আমাকে এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন যে, ঢাকায় একটি শান্তিপূর্ণ সরকার গঠনের জন্য ব্যবস্থাবলী গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ডাকি। এই বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে এ কথা বলা আমার কর্তব্য মনে করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অবিলম্বে তাঁদের অঞ্চলকে ভারতীয় সৈন্য থেকে মুক্ত করতে চাইবেন। তদনুযায়ী, আমি ক্ষমতাঁর শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি এবং আবেদন করেছি যে, (১) অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। (২) পাকিস্তানের সশস্ত্র সৈন্যদের সসম্মানে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন। (৩) পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত কর্মচারীর প্রত্যাবর্তন। (৪) পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ থেকে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের নিরাপত্তা। (৫) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক তৎপরতা না চালানোর নিশ্চয়তাদানের ব্যবস্থা করা যায়। এই প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরণের জন্য এ একটি চূড়ান্ত প্রস্তাব। সশস্ত্র সৈন্যদের অস্ত্রসমর্পণের ব্যাপারে চিন্তা করা হবে না, এবং তার প্রশ্নই দেখা দিত না, এবং

যদি এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া না হয়, সশস্ত্র সৈন্যরা শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত লড়াই জারি রাখবে। এখানে নোট শেষ হচ্ছে। জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে এবং তিনি আপনার আদেশ পালন করার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।'

জেনারেল নিয়াজির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বার্তা গভর্নর আমাকে দেন। আমি আর মোজাফফর কোর হেডকোয়ার্টারে যাই ও অনুমোদন গ্রহণ করি। গভর্নর হাউসে ফিরে এলে গভর্নর এর প্রতিলিপি জাতিসংঘের প্রতিনিধির হাওয়ালা করতে বলেন। আমি তাই করি। কমিশন মিস্টার মোজাফফর, জেনারেল নিয়াজি, জেনারেল জমশেদ ও অ্যাডমিরাল শরিফের কাছ থেকে আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পেশ করেন:

'আমরা পূর্ব পাকিস্তানের অস্ত্রসমর্পণের বিবরণের সঙ্গে সম্পর্কিত অধ্যায়ে যেমন দেখেছি, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘে প্রেরণীয় যে বার্তার সত্যতা মেজর জেনারেল ফরমান আলী করেছেন, তাঁর অনুমোদন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর দিয়েছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে একটি নিষ্পত্তি ও যুদ্ধ বন্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবাবলীর রূপদানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে পূর্বাহ্নে অনুমতি অর্জন করেছিলেন। সেহেতু সেই অবস্থায় তাঁর ক্ষমতা ও পাঠানোর দায়িত্ব উক্ত অফিসারের উপর আরোপ করা যায় না। বস্তুত তিনি সে সময় তাঁর মামলা সাফ করার জন্য কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে পরীক্ষা করার দাবি করেছিলেন। সুতরাং কমিশনের সামনে প্রকাশমান সত্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এখন এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ বা তদন্তের কোনো প্রয়োজন নেই।'

জাতিসংঘে রাও ফরমান আলীর সিগন্যাল

মহাসচিব এই বিশেষ রিপোর্ট এই অনুরোধসহ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করেছেন যে, অত্যন্ত জরুরি মনে করে এর উপর চিন্তাভাবনা করা হবে।

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ শুক্রবার স্থানীয় সময় ১টায় সহকারী মহাসচিব (পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের সাহায্য কার্যক্রম) মিঃ পল মার্ক হেনরি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ আবদুল মালেকের সামরিক উপদেষ্টা মেঃ জে. রাও ফরমান আলী ও পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁরা নিম্নলিখিত পত্র মিঃ পল মার্ক হেনরিকে দেন :

(ক) প্রাপক : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

(খ) যেহেতু চূড়ান্ত ও বিধ্বংসী প্রকৃতির পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করা হয়েছে, তাই আমি আপনার অনুমোদনক্রমে নিম্নলিখিত পত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মিঃ পল মার্ক হেনরিকে প্রদান করছি।

১. পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর এই ইচ্ছা কখনো ছিল না তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে নিজেদেরকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে।

২. তথাপি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে পড়ে যা সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

৩. পাকিস্তান সরকারের সর্বদা এই অভিপ্রায় ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাসমূহের রাজনৈতিক মীমাংসার সন্ধান করা হোক। তাঁর জন্য আলোচনাও চলছিল।

৪. সশস্ত্র বাহিনী অসাধারণ সব অসুবিধা সত্ত্বেও খুবই সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ লড়েছে এবং এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু আরো রক্তপাত ও নিরপরাধ প্রাণের হানি ঠেকাবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করছি :

(অ) যেহেতু এই সংঘাত রাজনৈতিক কারণসমূহ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, তাই রাজনৈতিক সমাধান দ্বারাই তা শেষ করা দরকার।

(আ) তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলছি, তাঁরা ঢাকায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করুন।

(ই) এই প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে আমি এ কথা বলা অতি-আবশ্যকীয় মনে করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হবে, ভারতীয় বাহিনী অবিলম্বে তাঁদের রাজ্যক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান।

(ঈ) তাই আমি জাতিসংঘের প্রতি জোর দিয়ে বলছি, তাঁরা ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের ব্যবস্থা করুন, এবং সেই সঙ্গে এই দাবি করছি যে :

(এক) অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের ব্যবস্থা করা হোক।

(দুই) পাকিস্তানের সৈন্যদের সম্মানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হোক।

(তিন) পশ্চিম পাকিস্তানের যে সব অধিবাসী ফিরে যেতে চান, তাঁদের ফিরে যেতে দেওয়া হোক।

(চার) ১৯৪৭ থেকে যারা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করছেন তাঁদের রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হোক।

(পাঁচ) এ বিষয়ে গ্যারান্টি দেওয়া হোক, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে না।

(উ) এই প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে আমি স্পষ্টরূপে বলতে চাই যে, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরণের জন্য এ আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তাব।

(ঊ) পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের প্রশ্নই দেখা দিত না এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে এদিক থেকে চিন্তা করাই হবে না, যদি এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একটি সৈনিক বেঁচে থাকবে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) এম রহিম খানের ব্যাখ্যা
(তৎসহ 'প্রসঙ্গ : আফতাব কমিটি')

যখন থেকে ঢাকার পতন হয়েছে, কিছু গ্রন্থ ও সংবাদপত্রে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট কিছু কলামনবিস ও উত্তেজনাপিয়াসি পর্যবেক্ষকদের বিষয় হয়েছে। বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও পর্যবেক্ষণে ফৌজি ব্যক্তিদের চরিত্র ও তাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ বিক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ ফৌজি অফিসার সংবাদ-মাধ্যমে হেনস্থার লক্ষ্য হচ্ছেন, এবং তাঁদের চরিত্র হনন চলছে। তাঁরা কোনো সামরিক বা অসামরিক আদালতে অপরাধী প্রমাণিত না হলেও কেচ্ছা-কাহিনীপ্রিয় সংবাদপত্রের বিশেষ কিছু অংশ সেনাবাহিনীর চরিত্রকে নিয়ে ঘৃণাউদ্রেককারী সব অপপ্রচার চালাচ্ছে। এদের সম্পর্কে যতোই বলি না কেন, কিছুই বলা হয় না। এ এমন ঘৃণ্য কাজ কোনো সভ্য সমাজে যা কদাচিৎ দেখা যায় এবং ইসলামি শিক্ষার, যার আমরা দাবিদার, স্পষ্ট বিরোধী।

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে একটা ব্যাপক ভুল ধারণা এই যে, কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল দেশ ভেঙে যাওয়ার কারণসমূহের বিশ্লেষণ এবং সেই ট্রাজেডির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা। এই কমিশনের উদ্দেশ্য মোটেই তা ছিল না। বৈধ কর্তৃপক্ষ যথা প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর আসল উদ্দেশ্য ছিল: (ক) খুবই জ্যেষ্ঠ জজদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সংস্থা এমনভাবে গঠন করা যাতে দেশ ভাঙার অপরাধ কেবল এবং কেবল সেনাবাহিনীর কাঁধে চাপানো যায়। (খ) ভুট্টোর নিজের চরিত্র ও চক্রান্ত, যা এই জাতীয় ট্রাজেডির জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল তাঁকে চিরতরে বিচারবিভাগীয় তদন্তের সিলমোহর দিয়ে রক্ষা করা।

কমিশনের প্রকৃতির উপব একটু নজর ফেললে অর্থাৎ ১৯৭১-এর যুদ্ধের তদন্তের জন্য যে বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল তাই সে কথার সত্যতা প্রমাণ করবে। বিচার্য বিষয় ছিল 'সেইসব পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত করা যাতে পূর্ব কমান্ডের কমান্ডার পরাজয় মেনে নেন এবং তাঁর কমান্ডে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসমর্পণ করে এবং ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের যুদ্ধবিরতি রেখায় যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া হয়।'

কমিশনের প্রকৃতি ও তাঁর বিচার্য বিষয় থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তদন্ত বিশেষভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। এবং দেশকে দু'টুকরো করার ব্যাপারে প্রকৃত যারা দায়ী সেই আমলাদেরকে, বিশেষত দুই বৃহৎ রাজনীতিবিদকে স্পর্শ পর্যন্ত করা যায়নি।

ভুট্টো কী সুন্দরভাবে হামুদুর রহমান কমিশনের তৈরি করা এই বিরাট বিচারবিভাগীয় রক্ষাকবচ লাভে সফল হলেন তা কয়েক বছর পরে প্রকাশমান কাহিনীগুলো থেকে স্পষ্ট। ভুট্টোর সেই সাফল্য জনসাধারণের মনোযোগ সেনাবাহিনীর ব্যর্থতার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং নিজের ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার অভিনীত ভূমিকা থেকে তাঁকে দূরে রেখেছে। জাতির সঙ্গে এ মস্ত প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

আশ্চর্যের কথা, মিস্টার ভুট্টো সামরিক কার্যবিধি, সামরিক বিদ্যা ও সামরিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য সমরবিশারদদের বদলে অসামরিক বিচারকদের কমিশন নিয়োগ করলেন, যাঁরা প্রায় চূড়ান্ত অজ্ঞ ছিলেন কীভাবে বিভিন্ন অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয় ও সেই অনুযায়ী কীভাবে কাজ করা হয় এবং সমরবিদ্যার উপর রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কীভাবে পড়ে। যেসব প্রশ্ন তাঁরা করেন ও শুনানির সময় যেসব পর্যবেক্ষণ করেন তা প্রায় আনাড়ি রকমের হাস্যউদ্রেককারী ছিল। তাছাড়া, মিস্টার ভুট্টো সচিবরূপে যাঁকে নিযুক্ত করেন সেই জেনারেল আলতাফ কাদির ছিলেন মদ্যপ অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁর ভূমিকা সামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছে। তিনি ছিলেন 'কাগজে-কলমে' অফিসার যাঁর পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর রাগ। এক পর্যায়ে তাঁর কমান্ডার-ইন-চিফ হওয়ার আশা ছিল, কিন্তু মদ্যপতার ত্রুটিবিভ্রমপূর্ণ আচার-বিচারের জন্য তাঁকে অবসর দিয়ে দেওয়া হয়। সে সময়ের কমান্ডার-ইন-চিফ তাঁকে সচিব নিয়োগ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু ভুট্টো তাঁকে বাদ দিতে অস্বীকার করেন। যদিও কমিশনকে পরামর্শ দেওয়ার পক্ষে তিনি ছিলেন অশেষ অযোগ্য ব্যক্তি, কমিশনের সামনে ও তাঁর বাইরেও আমি তাঁকে সমরবিদ্যা ও অপারেশন সম্পর্কে জেরা করি, তাতে তিনি রাগ করেন। আমার কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, তাঁর বাহিনীতে কোনো কোনো বন্ধু, যাঁরা আমার সিজিএস পদে নিয়োগ পছন্দ করেননি, গুজব ছড়ানোর জন্য শয়তানি চক্রান্ত করেছিলেন, বেনামা চিঠিপত্র লিখেছিলেন, এবং তিনি তা বিশ্বাস করেন।

কমিশন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন প্রেসের সামরিক বাহিনী ও তাঁর জেনারেলদের বিরুদ্ধে সৃষ্ট মারাত্মক সব অভিযোগের মধ্যে ও বিরূপ পরিবেশে তাঁদের শুনানির অনুষ্ঠান করেন। কমিশনের উচ্চ সদস্যদের একজন তাঁর বাসায় সন্ধ্যাবেলা বেসরকারি বৈঠকে এমন সব গল্প বলতেন, যা দিনের অধিবেশনের বিরুদ্ধে যেতো, এবং প্রত্যেকে সেই সব গল্প নিয়ে হাসি-মস্করা করতো। ওই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে এক বাঙালি। সেইকালে যখন বাঙালিদের বিরুদ্ধ বিরূপ মনোভাব ব্যাপ্ত হয়েছিল, সেই সময়ে তিনি এ কাজের পক্ষে ঠিক মানুষটি ছিলেন না। নিজের চেয়ার ঠিক রাখার জন্য তিনি পক্ষপাতিত্ব করার ও ব্ল্যাকমেল হওয়ার মতো লোক ছিলেন। তিনি ইয়াহিয়ার অধীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে আনুগত্যের সঙ্গে সেবা প্রদান করেন। কিন্তু যখন ভুট্টোর অধীন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে (ইয়াহিয়াকে) জালিম বলে মত দেন। কমিশনের সামনে উপস্থাপিত অধিকাংশ অফিসার একবারও তাঁর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করেননি।

সাক্ষীদের জেরা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে কমিশনের ছাতার তলায় কোনো কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে মনগড়া ও বিদ্বেষপূর্ণ অভিযোগ সব আরোপ করা হয় এবং কমিশন সেগুলোকে সাক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। এ সুবিচার ও সামরিক ঐতিহ্যের স্পষ্টত বিকৃত অবস্থা ছিল। কমিশনের অবশ্য কর্তব্য ছিল, যিনিই হোন না কেন, অভিযোগকারীকে সাক্ষীকে সংক্ষিপ্ত জেরা করার অনুমতি দিতে হতো। তাতে দোষারোপ ও ভুল বক্তব্যের যাচাই হতো। আমার ক্ষেত্রে কমিশন কখনো, একবারও এ ইঙ্গিত দেন নি যে, আমার বিরুদ্ধে ভুল কাজ করার কোনো অভিযোগ করা হয়েছে। ফিরে আসা কোনো কোনো সামরিক কয়েদিকে কমিশনের সামনে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে ও ব্লাকমেল করা হয়েছে। আর আমার ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের কোনো জীবিত সদস্যকে, যিনি আমার বিভিন্ন অপারেশনের চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়নি। এখন আমি জানি, কেন।

এ কথা বিশ্বাস করা হয় যে, জেনারেল গুল হাসান অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন না, কেননা তিনি নতুন কমান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন। কিন্তু যেই তাঁকে সেই পদ থেকে সরানো হয়, তাঁর নামও তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেইভাবে, টিক্কা খান, যাঁর নাম বড়ো অভিযুক্তদের মধ্যে ছিল এবং যাঁকে বাংলার কসাই বলা হতো, যখন তাঁকে গুল হাসানের জায়গায় চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফ করা হলো, তাঁর নাম তালিকা থেকে তুলে দেওয়া হলো। এর থেকে জানা যায়, অন্তত কিছু নাম হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের তালিকায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল যেগুলো চিফ একজিকিউটিভের বিশেষ রকমের লক্ষ্যস্থল ছিল। তাঁদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন।

কয়েকজন অফিসার, যাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের কঠিন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়, যদিও তাঁদের অপরাধের মধ্যে ছিল ১৯৭১-এর সামরিক তৎপরতার কালে ব্যাংক আর সরকারি ট্রেজারি লুটপাট ও ধর্ষণ। সেই অফিসারদের মধ্যে এক ব্রিগেডিয়ারকে ভুট্টো কমিশনের রিপোর্ট প্রদানের পর লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দেন।

চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফ পদে নিয়োগ

আমি একমাত্র জ্যেষ্ঠ অফিসার ছিলাম যিনি ভারতের বন্দিত্ব থেকে বাঁচতে পেরেছিলেন। জখম হওয়ার কারণে আমাকে পূর্ব কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজির যথাবিহিত আদেশের অধীন ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা থেকে একটা ছোট হেলিকপ্টারে বার্মা পাঠানো হয়। এই হেলিকপ্টার কেবল চার ব্যক্তি অর্থাৎ দুই বৈমানিক, এক টেকনিশিয়ান ও এক আমাকে নিয়ে যেতে পারতো। আমি এক মাসের বেশি সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। ব্যাংকক হয়ে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফ রূপে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই পদ জেনারেল গুল হাসানের সি-ইন-সি হওয়াতে খালি হয়েছিল।

আমার পোস্টিং সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। জেনারেল গুল হাসানের তদন্ত ছাড়া আমার সিজিএসরূপে নিয়োগ কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যে হয়েছিল, এই অভিযোগ একেবারে

বিদ্বেষপ্রসূত। সি-ইন-সি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ডজন জেনারেলের মধ্যে থেকে কেন কোনো উপযুক্ত সিজিএস পেলেন না তাঁর জবাব কেবল তিনি দিতে পারেন। কিন্তু আমার নিয়োগের পর লক্ষণীয় রেষারেষি মাথাচাড়া দিলো, অ্যান্টি-ইস্টার্ন লবি পূর্ব পাকিস্তানে যাঁরা কর্তব্য পালন করেছিলেন সেই সমস্ত জেনারেলের বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করে দিলো। যখন মিঃ ভুট্টোর সঙ্গে ২৩ জানুয়ারি ১৯৭২ দেখা করলাম, তিনি কোলাকুলি করে আমার তারিফ করলেন এবং ঘৃণ্য দুশমনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে চলে যাওয়ার জন্য একমাত্র জেনারেলরূপে আমাকে হিরো বানিয়ে দিলেন। কিন্তু চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফরূপে যখন পাঞ্জাব আর ফ্রন্টিয়ারে পুলিশের বিদ্রোহ দমন করতে এবং সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ দমন করতে সামরিক বাহিনী ব্যবহারে অস্বীকার করলাম এবং বিশেষ করে যখন আমি সিন্ধুর অভ্যন্তরে ভুট্টোর ক্ষমতাবহির্ভূত পিপিপি-সৃষ্ট ভাষাগত হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে ফৌজ পাঠালাম তখন আমি নিশানা বনে গেলাম। তিনি লিখিত হুমকি দিলেন, জিএইচকিউ-এর সেইসব লোককে 'ফিক্‌স' করে দেবেন যারা তাঁর ইচ্ছার পথে বাধা হবে। আমি ছিলাম প্রধান লক্ষ্য। তাঁর পথ থেকে আমাকে হটানোর দরকার পড়লো। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টকে এই কাজের ফোরাম নির্বাচন করা হলো। মনগড়া সব কাহিনী দাঁড় করানো হলো। লড়াইয়ের ময়দান আর বাহিনী ছেড়ে চিকিৎসার জন্য প্রাইভেট হেলিকপ্টারে করে বার্মায় পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শেখানো-পড়ানো সাক্ষীদের মাধ্যমে নিন্দাবাদ করা হলো।

প্রসঙ্গ: আফতাব কমিটি

সাধারণ লোকের এ কথা জানা নেই যে, সরকার লে.জে. আফতাব আহমদ খানের অধীন তিন সশস্ত্র বাহিনীর পাঁচ পশ্চিম পাকিস্তানি জ্যেষ্ঠ অফিসারকে নিয়ে একটি পৃথক কমিটি গঠন করেছিলেন, যাতে তা হামুদুর রহমান কমিশনের সীমিত সামরিক ক্ষমতা এবং তাঁর স্পষ্ট ও ব্যাপক পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল তার জন্য কমিটি কর্নেল ও তাঁর উপরের সকল পদের জ্যেষ্ঠ অফিসারদের ব্যাপারগুলোর পর্যালোচনা করে। ঐ কমিটি সমস্ত বিভাগীয় ও ইনটেলিজেন্সের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে ও সমস্ত সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বিস্তৃত রিপোর্ট সুপারিশসহ পেশ করে। এই বিভাগীয় কমিটি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের আরোপিত সমস্ত অপরাধ থেকে আমাকে মুক্তি দেয়। তাঁর ফলে, মিস্টার ভুট্টো তো আমাকে 'ফিক্‌স' করতে চেয়েছিলেন, আমাকে সসম্মানে অবসর দেওয়া হয়। কেবল সম্পূর্ণ আফতাব কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হলেই বিভিন্ন অফিসারের চরিত্র ও ঢাকার পতনের সামরিক কারণের ওপর প্রকৃত আলোকপাত করা হবে।

ফৌজ ছেড়ে চলে যাওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা নিম্নরূপ:

২০ নভেম্বর ১৯৭১ আমাকে আমার দপ্তর ঢাকার সামরিক আইন সদর দপ্তর থেকে হঠাৎ হেডকোয়ার্টার্স পূর্ব কমান্ডে তলব করা হলো। জানানো হলো, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর

ভারতের হামলা পরদিন ২১ নভেম্বর ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। আমাকে পূর্ব সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স ১৪ ডিভিশনে থেকে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত ট্রুপের কমান্ড করত হবে। এই ট্রুপগুলো সাতটি মেলানো-মেশানো ব্যাটেলিয়ন নিয়ে গঠিত ছিল এবং প্রায় ২০০ মাইল সীমান্তের সঙ্গে ছোট ছোট সেকশন আর প্লাটুনে ছড়ানো ছিল। হেডকোয়ার্টার্স পূর্ব কমান্ড এই উদ্বেগজনক জটিল পরিস্থিতির চিন্তায় পড়ে গেলো। কারণ পূর্বিতা অনুযায়ী টুপসের সাহায্য ও কমান্ড সাজানো যুদ্ধ লড়ার পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত ছিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আমি এই সঙ্কটময় দায়িত্ব গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টারে করে ফেনি গেলাম, যাতে সেখানে আমি ৫৩ ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার্সের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তাঁদের সংযোগগুলো ব্যবহার করতে পারি। হেডকোয়ার্টার্স পূর্ব কমান্ড এই এডহক হেডকোয়ার্টার ৩৯ ডিভিশনের মতো করে দুশমনকে ধোকা দেওয়ার জন্য কায়েম করেছিল। যুদ্ধে ট্রুপসের কমান্ড করার জন্য ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্স প্রতিষ্ঠা করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাদের নিয়ে কয়েক মাস লেগে যায়।

পরবর্তী ২ সপ্তাহ সম্মুখবর্তী মোর্চাগুলোর দৈনিক পরিক্রমা করে আমি ট্রুপগুলোকে যেখানেই সম্ভব ছিল, উপযুক্ত ব্যাটেলিয়ন কনট্রোলের অধীন কম্পানি পজিশনে একত্র করলাম। কিন্তু সরকারের নীতির অধীন পূর্ব কমান্ড সীমান্ত থেকে ফিরে এসে পুরোপুরি প্রস্তুত ব্রিগেড পজিশনে কেলাবন্দির অনুমতি দিলো না এবং বস্তুত সেখানে একটি কম্পানিও রিজার্ভে ছিল না। নিঃসন্দেহে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জেনারেল আবদুল হামিদ (সিওএস, জিএইচকিউ) বরাবর চেষ্টা করতে লাগলেন, হেডকোয়ার্টার্স পূর্ব কমান্ডকে রেল-সংযোগ কুমিল্লা-ফেনি-চট্টগ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত রক্ষা করতে হবে। এতে পুরো সীমান্ত জুড়ে অগ্রবর্তী মোর্চাগুলো মারাত্মকভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। দুটি ছড়ানো ব্যাটেলিয়ন মিয়াবাজার আর চট্টগ্রামে ছিল, তাঁরা চাঁদপুর মোজাফফরগঞ্জকে প্রতিরক্ষা দিচ্ছিল। ৪ ডিভিশন শত্রুর এক ডিভিশন তাঁদের ওপর আক্রমণ করল। শত্রুর ট্যাঙ্ক আর বিমানের রক্ষাব্যবস্থা ছিল। ৫৩ ব্রিগেড ফেনি থেকে তখনো পিছু হটছিল যাতে পেছনে মোজাফফরগঞ্জে গড়ে তোলা প্রতিরক্ষা অবস্থান রক্ষা করতে পারে। উভয় ব্যাটেলিয়নের প্রতিরক্ষা অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেলো এবং শত্রু ৫৩ ব্রিগেড দখল করার আগেই মোজাফফরগঞ্জ পৌঁছে গেলো। সেভাবে পৌঁছে গেলো চাঁদপুর, যেখানে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার, ফিল্ড হাসপাতাল, সরবরাহ ও গোলাবারুদের বিরাট ভাণ্ডার ছিল, আর শত্রুর এগিয়ে আসা ব্রিগেডের মাঝখানে কিছুই ছিল না।

এভাবে ইএমই ওয়ার্কশপের লোকদের নিয়ে স্বগঠিত একটা ডিভিশন, হেডকোয়ার্টার্সের লোকদের একটা মিশ্রিত দল, তাছাড়া কমান্ডোদের একটা দল আর বিভিন্ন ইউনিটের একটা মিশ্র কমিটি মোজাফফরগঞ্জের পিছনে মোতায়েন করা গেলো, যাতে পশ্চাৎরক্ষা একশনে সাহায্য করতে পারে। প্রায় চারদিন তাঁরা শত্রুর ব্রিগেডকে চাঁদপুরের দিকে এগোনো ঠেকিয়ে রাখে। যখন ৬ নভেম্বর এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ৫৩ ব্যাটেলিয়ন, লাকসামে যাকে চাঁদপুরের ডিভিশন হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে মিলে তাঁর রক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা শত্রু ঘিরে ফেলেছে এবং গুম হয়ে গেছে তখন সিদ্ধান্ত করা

হলো, শত্রুর দখল থেকে বাঁচার জন্য চাঁদপুরে ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ও হাসপাতাল খালি করে দেওয়া যায়। পরিকল্পনা ছিল দাউদকান্দি হেডকোয়ার্টার আবার ডেমরা এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হোক যাতে দাউদকান্দি-কুমিল্লার সংযোগের মাথায় ব্রিগেডের উপর নিয়ন্ত্রণ এসে যায়। এই পূর্ববর্তী প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে হেডকোয়ার্টার পূর্ব কমান্ড পুরোপুরি অবহিত ছিল এবং আমার সমগ্র ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার দৃষ্টির মধ্যে ছিল। তাঁরপর আমি চাঁদপুর থেকে পিছু হটার কার্যক্রম চালু করলাম, তাঁর জন্য আমার হেডকোয়ার্টার পূর্ব কামান্ড এবং পূর্ব পাকিস্তানের নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিঙের পুরো নিশ্চয়তা ও সাহায্য হাতে ছিল। তাঁরা পরিকল্পনা রচনা করে নৌ পরিচালনা ও চলাচলের ব্যবস্থা করলেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি গানবোট পাঠালেন, যাতে চাঁদপুর থেকে ডিভিশন হেডকোয়ার্টার খালি করতে পারে ও অন্যান্য জিনিস সরাতে পারে। বস্তুত পিছিয়ে আসার সম্ভাবনাও পূর্ববর্তী সাহায্য এবং হেডকোয়ার্টার পূর্ব কমান্ড ও পূর্ব পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিঙের পূর্ণ সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়, তাই প্রশ্নও ওঠে না। যদি আমরা চাঁদপুর থেকে পিছিয়ে না আসতাম তাহলে সামরিক দিক থেকে তা মারাত্মক স্থবিরতা হতো। কারণ এই অবস্থায় আমি ও হেডকোয়ার্টার, পূর্ব কমান্ড জেনেশুনে ডিভিশন হেডকোয়ার্টার, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রশাসনিক লোকজনের ক্ষয়ক্ষতি ও শত্রুকে দখল দেওয়ার এবং বদলি জায়গায় পিছু হটার সুযোগ না নেওয়ার ও সঠিক রাস্তায় না চলার দোষে দোষী হতাম। শত্রুর বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এই পরিকল্পনায় নিহিত বিপদের কথা ভালো করে জেনেশুনেও তা মেনে নেওয়া হয়েছিল।

বস্তুত, অন্য লোকজন নিরাপদে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে গেলো এবং অবস্থান গড়ে তুললো। কিন্তু গানবোটে ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ধ্বংস হয়ে গেলো এবং আমি পিছু হটার সময় শত্রুর বিমান আক্রমণের কারণে আহত হয়ে গেলাম। যাই হোক, এর জন্য সেই সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা কিছুতেই কম হয় না।

এডহক ডিভিশন হেডকোয়ার্টার্সের ধ্বংসের পর হেডকোয়ার্টার্স পূর্ব কমান্ড ওই সেক্টরে সমগ্র ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে সামলে নেয়। এ হেডকোয়ার্টারকে বাঁচাবার জন্য সম্পূর্ণ সঠিক সামরিক কৌশলের অধীন পিছু হটার সিদ্ধান্ত ছিল, যেহেতু সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সমর্থন হেডকোয়ার্টার্স পূর্ব কমান্ড থেকে নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে যে বলা হয়, যুদ্ধের এলাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যেন আমি খেয়ালখুশি মতো ছেড়ে দিয়েছি—এ অসৎ অভিযোগ। এই অপারেশনে দেড় হাজারের বেশি মানুষ তাঁর সঙ্গে ১২০০ অনুগত অধিবাসী নিরাপদে চাঁদপুর খালি করে দেয়। এ অপারেশন তিনদিনের বেশি চলেছিল এবং শেষ মানুষটি পর্যন্ত চলে এসেছিল।

আর একটা বিষয় যা নিয়ে সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে লেখালেখি করা হয় তা এই যে, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে যেসব ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁদের কোর্ট মার্শাল হওয়া দরকার। আশ্চর্যের কথা, হামুদুর রহমান কমিশন নিজেই এ সিদ্ধান্ত করে বসেছেন। নিজে সিদ্ধান্তই কেবল কমিশন টানেনি, বরং কোর্ট মার্শাল ইত্যাদি সুপারিশও করেছেন।

কমিশনের বিচার্য বিষয় অনুযায়ী এ কাজ তাঁদের ছিল না। যখন জিএইচকিউতে জজ

এডভোকেট জেনারেলকে এসব মামলার, কোর্ট মার্শালে সম্ভাব্য বিচারের ব্যাপারে চিন্তা করার কথা বলেন, তিনি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত দেন। অভিযোগ প্রমাণ হতে পারে না। আসলে সরকার বা জিএইচকিউ-এর কোনো ইচ্ছা ছিল না কোনো বিচার হোক। কারণ সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের তামাশা প্রকাশ হয়ে পড়তো এবং আসল অপরাধীও প্রকাশ হয়ে পড়তো। হামুদুর রহমান কমিশন ও তাঁর রিপোর্টের সততা ও সত্যতা নিরূপণ করা অবিলম্বে দরকার। তাই পুরো সত্য জানার জন্য ভারতের হ্যান্ডারসন কমিশনের মতো আর এক উচ্চস্তরের বিভাগীয় কমিটি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট পরীক্ষার জন্য গঠন করা যায় এবং ১৯৭১-এর ট্রাজেডিতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকার তদন্তের জন্য আর একটি কমিশন নিয়োগ করা যায়। তা করা হলেই সম্পূর্ণ সত্য ধরা পড়বে।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

শেষে বর্তমানে ও ১৯৭১-এ আমাদের প্রিন্ট মিডিয়ার যে ভূমিকা সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা। ১৯৭১-এর আমাদের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় আর খবরের শিরোনামগুলোর উপর সামান্য দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরা আর সংবাদপত্রগুলো মুজিববিরোধী তৎপরতা কি রকম চালিয়েছিল আর আওয়ামী লীগের দাবিগুলোর যাবতীয় রকমের বিরোধিতা করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যেন সামরিক ব্যবস্থাই একমাত্র সমাধান ছিল, যা তাঁরা সবাই অনুমোদন করেন। কিন্তু তাঁরা অন্য কোনো পথ খোলা না রেখে দেশকে দু'খণ্ড করে দিলেন। সংবাদপত্রের সেই অংশই এখন আবার হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সংক্রান্ত বিতর্কে হাওয়া দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম উমরের প্রতিক্রিয়া

১৬ ডিসেম্বর ইংরেজি দৈনিক 'দি নেশনে' এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম উমর ১৯৭১-এর নাটক অর্থাৎ ঢাকার পতনের সঙ্গে তাঁর স্পষ্টত জড়িত থাকা সম্পর্কে এবং পরে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের ব্যাপারে খোলাখুলি তদন্ত দাবি করেছেন। তাতে এই ইঙ্গিতও করা হয় যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে সেই সব অভিনেতাঁর মধ্যে তাঁর ভূমিকাও রয়েছে।

জেনারেল বলেন, কমিশনের উদ্দেশ্য জ্ঞাতসারে দুই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সে দুটি হলো পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ ও পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়। 'নেশন' যখন জানতে চায়, জেনেশুনে এরকম সীমিত উদ্দেশ্য কেন রাখা হলো তখন তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি যা কিছু করেছেন তা তাঁর বিবেকের ডাকে করেছেন । কাজেই তাঁর একথা বলতে কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই, খোলাখুলি তদন্ত করা হোক, যাতে রেকর্ড ঠিক করার জন্য ঘটনাবলী পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা যায়।
কমিশনের রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশে বলা হয়েছে, অপরাধমূলক চক্রান্তে অংশগ্রহণ করার জন্য জেনারেল উমরসহ ছয় জেনারেলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মোকদ্দমা চালানো হোক। তিনি বলেন, এটা বোধগম্য নয়, কয়েকটি সরকারের (ভুট্টো, জিয়া, জুনেজো ও বেনজিরের) আমলে প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত এই রিপোর্টকে গোপন রাখা হলো কেন? তিনি বলেন, প্রকাশ করে দিলে তা জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হতো না। তিনি উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে উত্থাপিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জ্ঞাপন করেন। এই সূত্রে তিনি বাকি রিপোর্ট কেন প্রকাশিত হচ্ছে না সে সম্পর্কে জানতে চান।

অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল পীরজাদার প্রতিক্রিয়া

জেনারেল পীরজাদা বলেন, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দপ্তরে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসাররূপে তাঁর কর্তব্যসমূহের মধ্যে সেনাবাহিনীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা শামিল ছিল না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের অপসারণ বা ১৯৭০-এর নির্বাচনে কারচুপির চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে মত দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

'শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকারি আলোচনায় আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি বা জেনারেল ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের প্রত্যেক শর্ত মেনে নিয়েছিলাম। তবু আওয়ামী লীগওয়ালারা ফেডারেশনের বদলে কনফেডারেশনের দাবিতে অটল থাকেন।'

লে. জেনারেল (অবঃ) এরশাদ আহমদ খানের প্রতিক্রিয়া

১৯৭১-এ পশ্চিম সেক্টরের প্রথম কোরের কমান্ডের দায়িত্বে নিযুক্ত লে. জে. (অবঃ) এরশাদ আহমদ খান পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর উনিশ বছর পর আর্মি এক্টের অধীন কোর্ট অফ এঁাকোয়ারি গঠনের দাবি করেন। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের বিভিন্ন উদ্ধৃতি খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টির উল্লেখ করে তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে বলা হয়:

'যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতা অবৈধভাবে দখল করার ব্যাপারে ছয় জেনারেলের বিরুদ্ধে একটি যুক্তিসঙ্গত মোকদ্দমার ব্যবস্থা করা বাস্তবসম্মত হবে না, কারণ তাঁদের দুজন মারা গেছেন, তবু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা বিশিষ্ট সাক্ষী হতে পারেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা ১৯৭১-এর যুদ্ধকালে সংঘটিত সামরিক তৎপরতায় প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলোর পর্যালোচনা করা সম্ভব।' প্রথম কোরের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জে. এরশাদ এ কথার উপর জোর দেন যে, তদন্ত আদালতের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করবেন তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনের উদ্ঘাটন যথার্থ ছিল না। তাঁর মতে, প্রথম কোর ১৯৭১-এ পশ্চিম সেক্টরে সাফল্যের সঙ্গে সবচেয়ে বড় আর জবরদস্ত যুদ্ধে লড়েছে। জিএইচকিউ তাঁর যুদ্ধে আপন মিশন পূর্ণ করার জন্য প্রথম কোরকে একটি প্রতিরক্ষা দায়িত্ব অর্পণ করেছিল ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছিল। তাই সমস্ত কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করা হয়। আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, আমরা যেন যে কোনো অবস্থায় শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি, প্রত্যাবর্তনের চিন্তামাত্র না করি। তাই প্রথমে কোর তিন পদাতিক ডিভিশন ও তিন আর্মার্ড ব্রিগেড নিয়ে গঠিত শত্রুর আক্রমণ ও ফৌজকে উক্ত সীমান্তে কয়েক মাইল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখে। শত্রু আমাদের প্রতিরক্ষা মোর্চাগুলো বেদখল করতে অসমর্থ হয়। সুতরাং সামগ্রিক যুদ্ধের সময় কোনো ব্যাটেলিয়ন শত্রুকে আমাদের প্রতিরক্ষা এলাকায় একটা পা-ও রাখতে দেয়নি। তাঁরা কেবল আমাদের প্রত্যেক প্রাথমিক মোর্চাকে পেছনে ঠেলে দিতে সমর্থ হয় এবং দুটি ব্যাটেলিয়নকে শূন্য অঞ্চলের মধ্যে মাত্র একটি ছোট আঘাত হানতে পারে, যেখানে গুপ্তচর লোকদের কাতারবন্দি করে রাখা হয়েছিল। আমি এখানে এই বলতে চাই যে, আমি কোরের তৎপরতার আসল পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন করি, জিএইচকিউ ও ৮-ডিভিশন যার বিরোধিতা করে, কিন্তু শেষে যা গুরুত্বপূর্ণ তহসিল শাক্কারগড়ের উপর বারংবার আক্রমণ সত্ত্বেও তা ঠেকিয়ে রাখে।

এভাবে, মরালা হেড ওয়ার্কসের উপর শত্রুর দখল ঠেকাতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাক্রমে কমিশন এসব ব্যবস্থার সমালোচনা করেন, যদিও বিরাজের প্রতিরক্ষার নিশ্চয়তাঁর জন্য এ জরুরি ছিল। দুশমন যদি হেডওয়ার্কসের উপর কব্জা করে নিতো, তাঁর পরিণামে বিআরবিসমেত ওখানকার জলপ্রবাহী সমস্ত খাল শুকিয়ে যেতো আর পূর্বদিকে

দিপালপুর পর্যন্ত পানি বন্ধের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের তামাম প্রতিরক্ষা মোর্চা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, যদি শত্রু দীর্ঘকাল ধরে হেডওয়ার্কসের ওপর দখল রাখতো তাহলে তাঁর ফলে সে সমস্ত জমি ঊষর হয়ে যেতো। ওই জমির সেচ ওই খালগুলোর মাধ্যমে করা হয়।

ফার্স্ট কোরের কার্যক্রমের উপর আলোকপাতের জন্য তাঁরা তাঁদের লেখায় ভারতীয় জেনারেলদের অর্থাৎ মে. জেনারেল সুখবন্ত সিং (যিনি ১৯৭১-এ ভারতীয় বাহিনীর সামরিক কার্যক্রমের ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন) এবং যুদ্ধে ইন্ডিয়ান ওয়েস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইন-সি লে. জেনারেল কে. পি. ক্যান্ডিথের বিবরণের প্রতি নির্দেশ করেন। প্রথমোক্ত জন লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১০৭), ভারতের পরিকল্পনা ১৯৬৫-এর পরিকল্পনার চেয়ে কিছুটা ভালো ছিল। সেই যুদ্ধে ভারতীয় প্রথম কোর ১৯৭১-এর ১৪ দিনের যুদ্ধে আট মাইলের তুলনায় ২১ দিনে ৭ মাইল পাড়ি দিয়েছিল। এই সাফল্য পাকিস্তানি বাহিনীর প্রবল বিরোধিতাঁর বিরুদ্ধে অর্জিত হয় এবং যে পরিমাণ সরঞ্জামাদি ব্যবহৃত হয়েছিল এ সাফল্য তাঁর সমান হয়নি। মেজর জেনারেল বি. আর. প্রভু (৩৯ ভারতীয় ডিভিশন) যুদ্ধকে তাঁর অবস্থার হাতে ছেড়ে দেন ও একের পর এক ক্ষয়ক্ষতির নিরুপায় দৃশ্যগুলো দেখতে থাকেন। বস্তুত কে. কে. সিং (ভারতীয় প্রথম কোর কমান্ডার) ওটাকে একটা ধীর, শ্লথ সেক্টরে পরিবর্তিত করা বিবেচনার কাজ হবে বলে মনে করেন। সেখানেও তিনি যুদ্ধের জন্য কিছুই করেননি।

মে. জেনারেল বি. এস. আহলুওয়ালিয়া (৩৬ ভারতীয় ডিভিশন) কিছু ধীর মাইল অতিক্রম করে যুদ্ধের জন্য মাথা না ঘামিয়ে শাক্‌কারগড়ের উপর একের পর এক হামলা চালিয়ে নিজের বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর ফলে তাকে বারবার অপদস্থ হতে হয়। শেষোক্তজন অতোটা বাক্যবাগীশ নন, বরং তিনি বিনীতভাবে স্বীকার করেছেন (পৃষ্ঠা ১৬৬), 'শিয়ালকোট সেক্টরে' আমরা কিছুটা ধীরে চলি।

জেনারেল এরশাদ জোর দিয়ে বলেন, প্রথম কোর রাবী (ইরাবতী) নদীর পশ্চিমে শত্রুর প্রায় ৪০ বর্গমাইল এলাকা ধরমপুরও দখল করে নেয়, শত্রুকে নদী পার হতে বাধা দেওয়ার জন্য তা দখলে আনা হয়েছিল।

লে. জেনারেল (অবঃ) এরশাদ আহমদ খানের আরো আলোকপাত

হামুদুর রহমান কমিশনের সুপারিশসমূহের সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটন করেন এক সাংবাদিক ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখের এক ইরেজি দৈনিকে। ওইগুলোকে আর এক কলামিস্ট ৩ জানুয়ারি ১৯৯১ একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে স্পষ্ট করেন। সেই অনুযায়ী এক সুপারিশে কমিশন অভিমত দেন যে, নিজের অবশ্যকর্তব্যের ব্যাপারে অপরাধমূলক ও স্বেচ্ছাচারী অবহেলার জন্য আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো যায়, কেননা আমি আমার সামরিক ইউনিটের কার্যক্রমের গুরুত্ব যেভাবে নির্ণয় করি তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট জেলার শাক্‌কারগড় তহসিলের প্রায় ৫০০ গ্রাম কোনো যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুর হাতে তুলে দিই এবং তাঁর ফলে দক্ষিণে যুদ্ধরত বাহিনীকে জীবনের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়। আমি এরপর সত্বর আমাদেরই প্রেসনোটে এই অভিযোগ নাকচ করি। তাতে আমি দ্বিধাহীনভাবে এই দাবিও করি যে, আমার বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক, যাতে করে আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারি।

প্রায় এক বছরের মধ্যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিশনের প্রকাশিত সুপারিশগুলোর সত্যতা স্বীকার বা বাতিল করেন না। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে কমিশনকৃত সুপারিশের বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু করানোর স্বার্থে আমি ১৯৯১-এর আর্মি রেগুলেশনের অধীন চিফ অফ আর্মি স্টাফের কাছে দরখাস্ত প্রেরণ করে লিখিতভাবে এই মামলা জিএইচকিউতে নিয়ে যাই। নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত পাঠানোর জন্য চিফ অফ আর্মি স্টাফের কাছে অনুরোধ করতে গিয়ে আমি শেষে বলি, এই মর্মে আবেদন করা হচ্ছে যে, জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে ফাঁপিয়ে তোলা অভিযোগগুলোর তদন্তের জন্য একটি উপযুক্ত সামরিক বিচারবিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে আমার জবাব শোনার পর বৈধ কর্তৃপক্ষ শেষ সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। যদি আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য অনুযায়ী যথার্থ বলে প্রমাণিত না হয়, তাহলে সর্বসাধারণ ও উক্ত সামরিক ইউনিটগুলোর (যার আমি কমান্ড করেছি) বর্তমান প্রতিক্রিয়ার সংশোধনের জন্য তাঁর ঘোষণা সংবাদপত্রগুলোতে করা হোক। আর যদি তদন্ত আদালত যুদ্ধে কোর কমান্ডাররূপে আমাকে যথাকর্তব্য পালনে অপরাধমূলক ও স্বেচ্ছাচারমূলক অবহেলার দোষে দোষী পান তাহলে অবশ্যই সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়া হোক।'

অতি সম্প্রতি জিএইচকিউ থেকে আমি জবাব পেয়েছি। চিফ অফ আর্মি স্টাফ অনুগ্রহ করে নিজে তাতে সই করেছেন। পত্রের সার হচ্ছে, 'এখন পর্যন্ত সরকার কোনোভাবেই

হামুদুর রহমান কমিশনের সুপারিশ সরকারিভাবে সংবাদপত্রেও প্রচার করেননি, সর্বসাধারণকেও এ বিষয়ে অবগত করেননি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত অসত্যায়িত সুপারিশের কোনো বৈধ গুরুত্ব নেই। তাই এই পর্যায়ে সরকারের পক্ষে এ মামলা উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।'

যাই হোক, আমি আমার বিরুদ্ধে কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ করার জন্য কলামিস্টদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ আমি এখনো জীবিত এবং অভিযোগের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু যেহেতু তা কোনো সরকারি দপ্তর থেকে প্রকাশ করা হয়নি, তাই এ মামলার শেষ সিদ্ধান্ত ঠেকিয়ে রাখার জন্য মনে হচ্ছে সরকার উট পাখির ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। বিচারের দাবি পূরণ করা ও সর্বসাধারণকে আশ্বস্ত করার জন্য যদি পূর্ণ রিপোর্ট নাও হয়, অন্তত সংবাদপত্রগুলোতে সরকারিভাবে হামুদুর রহমান কমিশনের সত্যায়িত সুপারিশগুলোই প্রচার করে দেওয়া হোক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ থেকে ১৯৭১-এর সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের বিবরণ যা পাওয়া গেছে সেই সংক্রান্ত সুপাারিশও তাঁর মধ্যে যেন থাকে। এর থেকে এও পরিষ্কার হয়ে যাবে, কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের রাজনৈতিক কারণগুলোর পর্যালোচনার সাহস করেছেন কিনা এবং কমিশন ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ময়দানে অনুরূপ বিকৃতির মোকাবিলার জন্য কী ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন।

এ কথা বলা ঠিক নয় যে, কমিশন তাঁদের বিচার্য বিষয় অনুযায়ী কেবল সামরিক দিক থেকে সেই পরাজয়ের পর্যালোচনার এখতিয়ার রাখেন। কমিশন কোনোভাবেই এ কাজ করার অধিকারী নন। পাকিস্তান কমিশনস অফ এঁাকোয়ারি এক্ট, ১৯৫৬-এর ৫(২) দফার অধীন নিযুক্ত কমিশনকে বলা হয়েছে, তাঁরা সেসব অবস্থার তদন্ত করবেন যাতে পূর্ব কমান্ডের কমান্ডার অস্ত্রসমর্পণ করেন। এবং পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সেই আদেশে নিজেদের অস্ত্রও সমর্পণ করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তগুলোসহ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়ে দেওয়া হয়।

পরাজয়ের একটা কারণ

আমাদের পরাজয় ও পরিণামস্বরূপ অস্ত্রসমর্পণের একটি বড় কারণ পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ও সামরিক ব্যক্তিদের ক্রমান্বয়ী শত্রুতা; এছাড়া একটি কঠিন নদী-পরিকীর্ণ এলাকায় তৎপরতাঁর ব্যবস্থা করার পক্ষে ভারতীয় বাহিনীর হাতে তাঁর পরিপূর্ণ সুবিধাদি ছিল। বছরের পর বছর আমাদের অসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে এ শত্রুতা ছিল তাঁরই পরিণাম। বিশেষ করে ১৯৭১-এর রাজনৈতিক সঙ্কটের ব্যাপারে আইনের মধ্যে কমিশনের এ এক্তিয়ার ছিল যে, তাঁরা যে কোনো ব্যক্তিকে তলব করতে পারতেন, তাঁদের ওপর হাজিরার আদেশ প্রয়োগ করতে পারতেন এবং হলফনামার দ্বারা তাঁদের জেরা করতে পারতেন। কমিশন সেসব রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনার স্বার্থে, যে পরিস্থিতি পরে সামরিক ক্রিয়াকলাপের কারণে স্পষ্টত

খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করে, যার জন্য আমাদের সেনাবাহিনী অস্ত্রসমর্পণ করেছিল, সে ব্যাপারে সমস্ত অসামরিক সাক্ষীদের তলব করতে ব্যর্থ হলেন এবং আমাদের ইতিহাসে অশেষরূপে মারাত্মক রাজনৈতিক বিকৃতি ও ক্ষতি সৃষ্টি করে বিচারপতিরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখোশ উন্মোচন করলেন না। এর জন্য কমিশনকে জবাবদিহি করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলোতে ক্রমাগত ভিত্তিহীন সব দোষারোপ ছাপা হয়ে চলেছে: এক জেনারেল যুদ্ধের সময় তাঁর বাহিনী ফেলে পালিয়েছেন, আর একজন কোনো যুদ্ধ না করে ৫০০ গ্রাম শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছেন। বিনা কারণে দুনিয়া জুড়ে আমাদের লড়াকু ফৌজের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। পরিপূর্ণ তদন্ত ও পরীক্ষা করে এই উদ্ভট সব অভিযোগ দূর করা দরকার। সরকারের এ বিশ্বাস সৃষ্টি করা দরকার যে, দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর আরোপিত এই অসত্য কালিমা মুছে ফেলা হয়েছে এবং রেকর্ড ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।

কমিশনের রিপোর্ট

কমিশনের সামনের যে সব সাক্ষ্য উপস্থাপিত হয়েছে তা পরীক্ষা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ১৯৫৮ সালে সামরিক আইনের কার্যকালে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তারা যে নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই অবস্থাই বরং আরো বেশি দেখা গিয়েছিল ১৯৬৯-এ জেনারেল ইয়াহিয়া খান আরোপিত সামরিক আইনের পর।

কমিশনের মতে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ২৫ মার্চ খারাপ হয়ে যায়, যখন ইয়াহিয়া খান সেখানে মানুষের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী হলে দেখা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন : ৩টা-সোয়া ৩টার দিকে ৩৫০ থেকে ৪০০ পাকিস্তানি মিলিটারি ওখানে হামলা করে। তাঁরা এক এক করে তাঁদের কাপড় খুলে নেয়। আতঙ্কে তাঁদের মুখ থেকে চিৎকার বের হচ্ছিল। শাড়ি, সালোয়ার আর ব্রা টেনে টেনে এক দিকে ফেলে দেওয়া হলো। মেয়েদেরকে তাঁদের স্তন ধরে দাঁড় করানো হলো এবং ছড়ি দিয়ে পেটানো হলো। বৃহৎ সংখ্যক সামরিক ও অসামরিক অফিসার যারা কমিশনের সামনে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা সেই ভয়াবহ দিনগুলোর বিবরণ দিয়েছেন। ওই সময়ের ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ আশরফ বলেন, 'সামরিক তৎপরতাঁর পর বাঙালিদেরকে নিজ বাসভূমে পরবাসী করে দেওয়া হয়েছিল।'

ব্রিগেডিয়ার ইকবালুর রহমান শরিফ কমিশনকে বলেন, সামরিক ইউনিটগুলোর পরিক্রমাকালে তিনি দেখেছেন, জেনারেল গুল হাসান সৈন্যদের বলতেন :

'তোমরা কতজন বাঙালি কতল করেছ?'

আর এক সাক্ষ্য অনুযায়ী, যেদিন লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি পূর্ব পাকিস্তানে বাহিনীগুলোর কমান্ড লাভ করেন, তিনি তাঁর লোকদের বলেন:

'এ শক্রর এলাকা। যা কিছু হাতের কাছে পাও নিয়ে নাও। আমরা বার্মায় তাই করতাম।'

বাঙালি, তা সে সৈন্য হোক বা সাধারণ নাগরিক, হিন্দু হোক বা মুসলমান, তাঁকে শক্র মনে করা হতো। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও জওয়ানদের বৃহৎ সংখ্যায় মেরে ফেলা হয়। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের গণহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে এক সাক্ষী, ৯ ডিভিশনের জিএসও লে. কর্নেল মনসুরুল হক বলেন: সিও লে. কর্নেল ইয়াকুব মালিকের হুকুমে এক অফিসারের মাত্র আঙুলের ইশারায় ১৭ জন অফিসার ও ৯১৫ জন জওয়ান খতম করে দেওয়া হয়।

১৬ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ, ৯ ডিভিশনের জিওসি মে.' জেনারেল এ. এইচ আনসারী এবং ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকের সিদ্দিকী প্রকাশ করেন যে, সাতজন সিনিয়র অফিসার ও তাঁদের ইউনিটগুলো ব্যাপকভাবে লুটপাট করে। তাঁর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংকের সিরাজগঞ্জ ট্রেজারি থেকে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার চুরিও রয়েছে। ওই অফিসারদের মধ্যে ছিলেন ব্রি. জাহানজেব আরবাব, লে. কর্নেল মোজাফফর আলী খান জাহেদ, লে. কর্নেল বশারত আহমদ, লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজ, লে. কর্নেল মোহাম্মদ তোফায়েল ও মেজর মোহাম্মদ হোসেন শাহ।

জেনারেল নিয়াজির অতীত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করতে গিয়ে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, যখন তিনি শিয়ালকোট আর লাহোরের জিওসি আর সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সামরিক আইনের অধীন মোকদ্দমাগুলোতে টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। আর লাহোরের গুলবার্গের সায়িদা বুখারির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সায়িদা 'সিনোরিতা হোম' নামে বেশ্যালয় চালাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে সায়িদা ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করার জন্য জেনারেল নিয়াজির বিরুদ্ধে নৈতিকতা বিরোধী কাজ ও চোরাচালানের যে অভিযোগ রয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে সত্য।

কমিশনের রিপোর্টে ১৯৭১-এর যুদ্ধের পরাজয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করে তাঁর নিচে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি বাহিনী তাঁর যে প্রচলিত ধারণা গড়ে তুলেছিল তা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। লে. জেনারেল নিয়াজি কমিশনকে বলেন, পাকিস্তান যদি পশ্চিম ফ্রন্ট না খুলতো তাহলে ভারত কখনো পূর্ব পাকিস্তানে বড়ো আকারের যুদ্ধ করতো না। আমরা মনে করি, এই বিবৃতির মধ্যে পূর্ব ফ্রন্টে শত্রুর দ্রুততাঁর সঙ্গে অভিযান চালানোর আশঙ্কার পূর্বানুমান রয়েছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, ভারতে প্রশিক্ষণ পাওয়া সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা করার যোগ্য হবে না, এবং ভারত দীর্ঘকাল জুড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেও পারবে না। ভারতের পক্ষে পূর্ণ যুদ্ধ শুরু করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় পাকিস্তানের পক্ষে একমাত্র পথ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষার সেই প্রচলিত ধারণা অনুসরণ করা। তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার যে ধারণা তা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতীয় বাহিনী ২১ নভেম্বর ১৯৭১ সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করলো এবং নগ্ন আগ্রাসন চালিয়ে গেলো। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিম ফ্রন্ট খুলতে দেরি করা হলো, তাঁর উপরে যে দ্বিধার সঙ্গে তা করা হলো তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হলো।

কমিশনের সিদ্ধান্তে লেখা হয়েছিল: 'সামরিক কমান্ডারগণ এবং মিলিটারি নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। সামরিক আইনের অধীন নিছক প্রথাগতভাবে চলে আসা প্রশাসনের দরুন এই কমান্ডাররা প্রকৃতিগতভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত ও পেশাগতভাবে অযোগ্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ইচ্ছার অভাব ছিল আর সংকল্পের ত্রুটি ছিল। তাঁরা যুদ্ধ করার যোগ্য ছিলেন না।'

কমিশন সুপারিশ পেশ করতে গিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লে. জেনারেল এসজি পিরজাদা, লে. জেনারেল গুল হাসান, মেজর জেনারেল উমর এবং মে. জেনারেল মিঠার বিরুদ্ধে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের কাছ থেকে জবরদস্তি ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগের জন্য প্রকাশ্য আদালতে মোকদ্দমা চালানো যায়।'

'উপরন্তু তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে, সেখানে আইন অমান্য আন্দোলন ও আওয়ামী লীগের সশস্ত্র বিদ্রোহ হলো এবং তাঁর পরিণামস্বরূপ আমাদের সেনাবাহিনীকে সেখানে আত্মসমর্পণ করতে হলো। পাকিস্তান ভেঙে গেলো।'

কমিশন এই সুপারিশও করেন যে, এই অফিসারদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অপরাধমূলক অবহেলার অভিযোগেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কমিশন এই সুপারিশও করেন যে, লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি, মে. জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদ, মে. জেনারেল রহিম খান, ব্রিগেডিয়ার জি.এম. বাকের সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত ও ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আসলাম নিয়াজির কোর্ট মার্শাল করা যায়। কমিশন সুপারিশ করেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আবদুল হামিদ খান ও মে. জেনারেল খোদাদাদ খানের বিরুদ্ধে অসচ্চরিত্রতা, মদ্যপতা ও খারাপ ব্যবহারের অভিযোগের জন্য রীতিমতো তদন্ত করানো যায়, কারণ আপাতদৃষ্টিতে প্রমাণ হয় যে, তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রের অপকৃষ্টতাঁর কারণে অসিদ্ধান্ত, ভীরুতা ও পেশাগত অযোগ্যতাঁর ফল ফলেছে। কমিশন সুপারিশ করেন, লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি ও অন্যান্য অফিসারের ব্যক্তিগত দুশ্চরিত্রতাঁর অভিযোগ সমূহরও পরীক্ষা করানো যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে খবর রয়েছে, তাঁরা অর্থসম্পদ লুটপাট করেছেন, মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। তাঁরা এ কাজ করেছেন এমন সময় যখন তাঁদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দরকার ছিল। লে. জেনারেল নিয়াজির বিরুদ্ধে এই অভিযোগও ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডারের ক্ষমতাবলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে পান চোরাচালানী করতেন। কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক, আর এক ব্রিগেডিয়ার হায়াত পশ্চিম পাকিস্তানের মকবুলপুর সেক্টরে ১২ ডিসেম্বর রাতে নিজের মোর্চার মধ্যে কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে আমোদ-ফূর্তি করছিলেন। তখন বাইরে যুদ্ধের ময়দানে ভারতীয় গোলাগুলির বৃষ্টি হচ্ছিল।

কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ

প্রখ্যাত সাংবাদিক মুশাহদ হোসেন হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের ১০টি সুপারিশ তাঁর আসল রূপে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, অতীতের ত্রুটি আর ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের জন্য দরকার এই বিষয়গুলোর ভালো রকম পর্যালোচনা করে এগুলোকে ভালো করে বোঝা।

সুপারিশগুলো নিম্নরূপ :

(১) ২৫ মার্চ ১৯৬৯ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের কাছ থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতায় আনার অপরাধমূলক চক্রান্তে অংশগ্রহণ করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লে. জেনারেল এস.জি.এম.এম. পিরজাদা, মে.জেনারেল উমর, লে. জেনারেল গুল হাসান ও মে. জেনারেল মিঠার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো যায়। দরকার হলে শক্তি প্রয়োগ করে তা করা যায়। নিজেদের যৌথ উদ্দেশ্যকে জোরদার করার জন্য তাঁরা নির্বাচনের সময় বিশেষ রকমের ফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের পরিকল্পনাকে সফল করার প্রক্রিয়ায় হুমকি, প্রলোভন ও ঘুষের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং পরে ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে প্রলোভনও দেখান। তদুপরি তাঁরা একে অপরের সঙ্গে চুক্তি করে পূর্ব পাকিস্তানে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যা আইন অমান্য আন্দোলন, আওয়ামী লীগের সশস্ত্র বিদ্রোহ ও পরে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও আমাদের দেশ ভেঙে যাওয়ার কারণ হয়ে ওঠে।

(২) পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়স্থানে যুদ্ধের ব্যাপারে অবশ্যকর্তব্য পালনে অপরাধমূলক অবহেলার দরুন পূর্ববর্ণিত অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় বা তাঁদের কোর্ট মার্শাল করা যায়।

(৩) পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনী যে জুলুম ও অত্যাচার চালিয়েছে তাঁর তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আদালত বা তদন্ত কমিশন গঠন করা দরকার এবং যেসব ব্যক্তি পাশব অত্যাচার ও নির্যাতন এবং নৈতিক অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হবেন তাঁদের যথাবিধি শাস্তি দেওয়া যায়। যদি তাঁর ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে

অন্তত কমিশন গঠনের কথা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা যায়, যাতে আমাদের জাতির বিবেক ও বিশ্বজনমত শান্ত হয়।

(৪) কী অবস্থায় মে. জেনারেল রহিম খান পূর্ব পাকিস্তানে ৩৯ এডহক ডিভিশনকে নিয়ে গঠিত তাঁর বাহিনীকে একা ফেলে রেখে তাঁর এখতিয়ারের বাইরের একটি স্থানের দিকে চলে গেলেন তাঁর একটি বিভাগীয় তদন্ত করানো যায় এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাঁর ফেরার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আলোকপাত বা অনুসন্ধান না করেই কী অবস্থায় তাঁকে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ নিয়োগ করা হলো সে বিষয়েও পর্যালোচনা করা যায়।

(৫) এই ধরনের তদন্ত পাকিস্তান নৌবাহিনীর কমান্ডার গুল জররিনের ব্যাপারেও করা দরকার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি খুলনার পিএনএস তিতুমীর নৌ-ঘাঁটি আদেশ পাওয়ার আগেই ছেড়ে চলে যান।

(৬) এই ধরনের তদন্ত নিম্নলিখিত অফিসারদের ব্যাপারেও করা যায়। জানা যায়, তাঁরা যুদ্ধের সময় যার যার কর্তব্য ও দায়িত্ব কোন্ কোন্ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করেছেন :

(ক) শেষ যুদ্ধের সময়ে কমান্ডার, প্রথম কোর. লে. জেনারেল এরশাদ আহমদ খান;

(খ) জিওসি, ১৫ ডিভিশন, মে. জেনারেল আবিদ জাহিদ এবং

(গ) জিওসি, ১৮ ডিভিশন, মে. জেনারেল বি. এম. মুস্তফা।

আমাদের মনে হয়, এই অফিসারদের কেবল অবসর প্রদান যথেষ্ট নয়। যদি তাঁরা কর্তব্য পালনে অবহেলা ও ভীরুতাঁর দোষে দোষী প্রমাণিত হন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

(৭) যখন মে. জেনারেল ফরমান আলী, লে. জেনারেল নিয়াজি এবং আরো কয়েকজনকে পাওয়া যাবে (তাঁরা এখন ভারতে সামরিক বন্দী) তখন সেইসব বিষয়েও উপযুক্ত অনুসন্ধান করানো যায়, যাতে জানা যায়, জেনারেল ফরমান আলী মি. পল মার্ক হেনরির মাধ্যমে তাঁর যে বার্তা জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কে তাঁকে এ কাজের অধিকার দিয়েছিল?

(৮) আমরা আরো সুপারিশ করছি যে, সরকারি ক্ষমতাঁর অপব্যবহার ও অপচয়, ভীরুতা ও পেশাগত অযোগ্যতাঁর ফলে সৃষ্ট নিজের স্বভাববিকৃতির মাধ্যমে দেশকে ধোকা দেওয়া সংক্রান্ত আদেশ-নির্দেশ এবং আমাদের রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ের ৫ম অংশে বর্ণিত জ্যেষ্ঠ সামরিক কমান্ডারদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অভিযোগসমূহের পূর্ণ তদন্ত করা যায়।

(৯) যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণের কারণ সংক্রান্ত আমাদের সিদ্ধান্তসমূহ পরীক্ষামূলক, তাই আমরা সুপারিশ করছি যে, পূর্ব কমান্ডের কমান্ডার ও অন্যান্য অফিসারগণ (যাঁরা এখন ভারতে সামরিক বন্দীরূপে রয়েছেন) তাঁদের পাওয়া গেলে যে কারণে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন সেই অবস্থা সম্পর্কে আরো একটি

অনুসন্ধান চালানো যায়।

(১০) যে পর্যন্ত যুদ্ধের উচ্চতর অধিনায়কতাঁর সম্পর্ক সে সম্পর্কে আমরা নিম্নরূপ ব্যবস্থাবলী সুপারিশ করছি :

(ক) কমান্ডার-ইন-চিফের পদগুলোর স্থলে উক্ত সার্ভিসের চিফ অফ স্টাফকে ন্যস্ত করা যায় (আমরা জানতে পেরেছি, প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই তা করেছেন)।

(খ) মন্ত্রিপরিষদের (ক্যাবিনেটের) প্রতিরক্ষা কমিটিকে নতুন করে সক্রিয় করা যায় এবং নিশ্চয়তা দেওয়া যায় যে, কমিটির বৈঠকগুলো যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির চার্টারে নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ তারিখে বা কমপক্ষে প্রতি তিনমাসে একবার তাঁর বৈঠক ডাকার ব্যবস্থা শুরু করার অধিকার ক্যাবিনেট ডিভিশনকে দেওয়ার জন্য চার্টারে একটি স্থায়ী নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালের মেয়াদ অনুযায়ী বৈঠক সেই-সম বর্তমান সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে।

পরিশিষ্ট

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার কর্তৃক হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ

পাকিস্তানের জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সামরিক সরকার ৩০ ডিসেম্বর ২০০০ বহুপ্রতীক্ষিত হামুদর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের জন্য তৎকালীন সামরিক নেতৃত্বকে দায়ী করে তাদের বিচারের সুপারিশ করা হয়েছে।

ভারতের ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকা দীর্ঘ ২৫ বছর বস্তাবন্দি হয়ে থাকা হামুদুর রহমান কমিশনের সম্পূরক রিপোর্টটি ফাঁস করে দেওয়ার পর মূল রিপোর্টটি প্রকাশের জন্য বর্তমান শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফের ওপর চাপ বাড়ছিল। মোশাররফ সরকার মূল রিপোর্টের স্পর্শকাতর অংশগুলো বাদ দিয়ে তা প্রকাশ করার ঘোষণা দেয়। গতকাল ইসলামাবাদে হামুদুর রহমান কমিশনের মূল রিপোর্টের অনুমোদিত অংশগুলো প্রকাশ করা হয়।

কমিশনের রিপোর্টে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে এবং লজ্জাজনক বলে অভিহিত করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, 'ঢাকাকে আরো কিছু দিন টিকিয়ে রাখা যেত। পূর্ব পাকিস্তানে তখন এত দ্রুত আত্মসমর্পণের মতো কোন ঘটনা ঘটেনি।'

রিপোর্টে বলা হয়, তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আত্মসমর্পন করার জন্য অনুমতি, এমনকি প্ররোচনাও দিয়েছিলেন। এজন্য ইয়াহিয়া ও তার কিছু শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তার প্রকাশ্য বিচারের সুপারিশ করেছে কমিশন। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের পরে ইয়াহিয়া ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এর কয়েক বছর পর তিনি মারা যান। কিন্তু তার অনেক ঘনিষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা এখনো বেঁচে আছেন এবং পেনশন নিয়ে অবসর-জীবন কাটাচ্ছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, তখন ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক, মানবিক, মানসিক ও সামরিক কারণে ৯০ হাজারের বেশি পাকিস্তানের সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য আত্মসমর্পণ করেছিল। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের পরে যুদ্ধবন্দি পাক সেনারা মুক্তি পায়।

ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধিতা করার জন্য ভূট্টোর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, সাক্ষীদের উদ্ধৃতি অনুযায়ী মার্শাল ল'য়ের মাধ্যমে আসা সরকারের কর্মকাণ্ডে সামরিক বাহিনী নিয়মিতভাবে নাক গলিয়েছে। এ কারণেই শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তাদের অনেকেই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, সামরিক কর্মকর্তাদের এই নৈতিক অধঃপতন এবং অদক্ষতা ১৯৫৮ সালের পর থেকে কমবেশি সবখানেই ফুটে উঠেছে।

এমনকি দায়িত্ববান সামরিক কর্মকর্তারা কমিশনকে বলেছে যে, মদ্যপান, নারী আসক্তি এবং বাড়িঘর ও সম্পত্তির লোভ উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের এমনই অবস্থায় নিয়ে গেছে যে, তারা কেবল লড়াই করার মনোবৃত্তিই হারায়নি একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পেশাগত দক্ষতাও হারায়।

কমিশনের রিপোর্টে ১৯৭১ সালের সহিংসতা শুরু করার জন্য বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ দলকে দোষারোপ করেছে। কিন্তু তাতে এও বলা হয়েছে সামরিক বাহিনী সাধারণ জনগণের ওপরও বাড়াবাড়ি আচরণ করেছে। কমিশন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আদালত প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করে। কমিশন আরো বলেছে, বেশ কিছু সাক্ষ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর সামরিক নির্যাতনের অভিযোগের কিছু নজির রয়েছে।

তবে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্যাতনকারী জীবিত পাকিস্তানি জেনারেলদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কে সরকার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। সামরিক সরকারের নির্বাহী জেনারেল মোশাররফ গত অক্টোবরে বলেছে, ১৯৭১ সালের ঘটনা ছিল একটি রাজনৈতিক ও সামরিক পরাজয়। জেনারেলদের বিচারের উদ্যোগ নেওয়াটা যথোপযুক্ত নয়।

[ঢাকার ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখের দৈনিক 'প্রথম আলো' থেকে]